গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ রাজ্য
— পৃঃ ২৩

দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ১২ জুন, ২০২৩।। ২৮ জ্যৈষ্ঠ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

দেশজুড়ে জল সংকট

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১২ জুন - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘শেষের সেদিন বড়ো ভয়ংকর’ মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি আর শাসকের মৃত্যুঘণ্টা ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

সোনা বউমা ও পিসি শাশুড়ি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ন'টি বছরের অতিক্রমণ একটি অবিশ্বাস্য পদচিহ্ন ◻ এস. জয়শঙ্কর ◻ ৮

কেরালা স্টোরির বাস্তবতার প্রমাণ মিলল জব্বলপুরে ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন হওয়ায় দেশবাসী আনন্দিত এবং গর্বিত ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১১

মোদী সরকারের নয় বছর ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ১৩

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি অনেক মজবুত হয়েছে ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৭

গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ রাজ্য ◻ হীরক কর ◻ ২৩

জলদূষণেই কি জীবনের অবলুপ্তি? ◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ২৬

জলের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে ◻ সৌরভ সিংহ ◻ ২৯

বাঙ্গালির প্রতাপ প্রতাপাদিত্যে ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩১

ফকিরি অত্যাচারের প্রতিরোধে ভারতের নাগাসন্ন্যাসীরা ◻ উত্তম কুমার মণ্ডল ◻ ৩২

কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কর্তা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৩

ভক্তদের কর্মফল হরণ করেন ফলহারিণী মা কালী ◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৩৪

ট্রান্সফ্যাট জারিত খাদ্যদ্রব্যের কুফল হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ◻ অধ্যাপক ডাঃ সমর সরকার ◻ ৩৫

সংসদের নতুন ভবন উদ্বোধনে যোগদান না করে বিরোধীরা আত্মঘাতী গোল করলো ◻ তারক সাহা ◻ ৩৮

ভিন্ন জনগোষ্ঠীর অভিন্ন জ্যোতিষকথা ◻ সৌমেন নিয়োগী ◻ ৪৩

বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো অসুখ ◻ শঙ্কর নিয়োগী ◻ ৪৪

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ **অঙ্গনা : ২১** ◻ **সুস্বাস্থ্য : ২২** ◻ **অন্যরকম : ৩৯** ◻ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯** ◻ **চিত্রকথা : ৫০**

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৯ জুন, ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১৯ জুন, ২০২৩

রথযাত্রা

যাত্রা মানে যাওয়া। যাওয়া মানে গতিশীলতা। সনাতনী শাস্ত্রকারেরা আমাদের এক পরম গতিশীলতার সঙ্গে জুড়ে রেখেছেন, ভুলতে দেননি। জীবন মানেই এগিয়ে চলা। প্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উদ্দেশ্যও তো তাই। দৈনন্দিনের জড়তা কাটিয়ে বেরিয়ে পড়া, এগিয়ে চলা। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় প্রভু জগন্নাথদেব আর তাঁর ভুবনখ্যাত রথযাত্রাকে স্মরণ করব আমরা। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জলমেব জীবনম্

গত মার্চ মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে নিউইয়র্ক শহরে 'বিশ্ব জলসংকট' শিরোনামে একটি সম্মেলন সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পূর্বে 'বিশ্ব জুড়িয়া জলজনিত সংকট আসন্ন' নামে একটি সতর্কবার্তাও প্রকাশ করিয়াছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। সুখের বিষয় যে বিশেষজ্ঞরা অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন যে বিশ্ব জুড়িয়া ক্রমশ প্রকট হইতেছে জলসংকট। এবং আর তাহা কয়েক বৎসরের মধ্যেই চরম আকার ধারণ করিতে পারে যদি এখনই বিশ্ববাসী সচেতন না হইতে পারে। এই সতর্কতার উল্লেখ তো ভারতবর্ষ বহু পূর্বেই করিয়াছে। ভারতবর্ষের শাস্ত্রগ্রন্থে জলকে প্রাণতত্ত্ব বলা হইয়াছে। বেদে জলকে জীবকুলের জননী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋকবেদে জলের মহিমা বর্ণনা করিয়া ' আপো বৈ প্রাণঃ', 'জলমেব জীবনম্' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। অথর্ববেদে জলকে শুদ্ধ রাখিবার জন্য যেমন প্রার্থনা করা হইয়্যাছে, তেমনই জলদূষণকারীকে দণ্ডদানের কথাও বলা হইয়াছে। যজুর্বেদে সাবধানবাণী উচ্চারিত হইয়াছে ' মা আপো হিংসী', অর্থাৎ জলকে কেহ দূষিত করিবে না। কিন্তু এইসব শাস্ত্রবাক্যে কেহ কর্ণপাত করে নাই। অবশেষে টনক নড়িয়াছে ১৯৯৩ সালে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে ওই বৎসর হইতে ২২ মার্চ দিনটিকে 'বিশ্ব জল দিবস' রূপে পালন করিয়া বিশ্ববাসীকে সচেতন করিবার প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া ভারতবাসী ভুলিয়াছে নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞান। কৃষিবিপ্লবের নামে ভূগর্ভস্থ জলের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং শিল্প স্থাপনের নামে নদ-নদী, বিভিন্ন জলাশয়-সহ ভূগর্ভস্থ জলকেও দুষিত করিয়া চলিয়াছে। পরিণামে পানীয় জলের অভাব হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন মারণরোগে আক্রান্ত হইতেছে মানুষ। পৃথিবীতে ৯৭ শতাংশ জল থাকিলেও মানুষের ব্যবহারের জন্য রহিয়াছে মাত্র ১ শতাংশ। সেই জলের যথেচ্ছ ব্যবহার ও দূষণের ফলেই অবস্থা ক্রমেই সংকটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। সুলভ পানীয় জল ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ অর্থের বিনিময়ে পানীয় জল ক্রয় করিতে হইতেছে মানুষকে।

জল অপচয়ের তালিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম সারিতে রহিয়াছে। কিন্তু ভারতও কম কিছু নহে। নিত্য জলের অপচয়, অপব্যবহার ও দূষিত করিবার ফলে ভারতবাসীও তীব্র জলসংকটের মুখে পড়িয়াছে। একটি সমীক্ষায় জানা গিয়াছে, এইভাবে জলের অপচয় ও জল দূষিত হইলে ২০২৫ সাল হইতে ভারত এবং ২০৩০ সাল হইতে সমগ্র বিশ্ব চরম জলসংকটের সম্মুখীন হইবে। ভারতে চেন্নাই ব্যতীত শহরাঞ্চলে জলের অভাব কিছুটা কম অনুভূত হইলেও গ্রামাঞ্চলের মানুষ শুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা হইতে প্রায় বঞ্চিত রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও কম ভয়াবহ নহে। এই রাজ্যের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার মানুষদের এখনো জলের জন্য ছুটিতে হয় দূরের নদীতে কিংবা কোনো ঝোরায়। রাজ্য সরকার আর্সেনিক মুক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অপ্রতুল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ঘরে ঘরে জল সরবরাহের কথা ঘোষণা করিয়া তাহার কিয়দংশ পূরণও করিয়াছে। কিন্তু অপচয় ও দূষিত করিয়া জলের উৎস নষ্ট করিলে সরকারই-বা করিবে কী ? কিন্তু কাহারও তো সচেতন হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বিশ্ব জল দিবসে দুই-একটি সভা সমিতি করিয়াই কর্তব্যক্তিরা দায় সারিয়া ফেলিতেছেন। এই রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ এলাকায় জলদূষণ মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। এইসব এলাকার জলের নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ও আর্সেনিকের উপস্থিতি রহিয়াছে ওই জলে। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, এই সব জল পান করা তো দূরের কথা, ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাহা বিপজ্জনক। প্রকৃতিবিদগণ বলিতেছেন, জল সংকটের অন্যতম কারণ হইল, নগরায়ণের জন্য ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদন করিবার ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হইয়াছে। ইহার ফলে সমগ্র বিশ্বে জলচক্রেরও ভারসাম্য ব্যাহত হইয়াছে। জলচক্রের সাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক বৃক্ষরোপণ। নিবিড় বনসৃজনই জলসংকট দূরীভূত করিয়া মানবজাতি-সহ সমগ্র প্রাণীকুলকে রক্ষা করিতে পারে। কেননা, শাস্ত্রে যেমন জলকে জীবন বলা হইয়াছে , তেমনই বৃক্ষকে বলা হইয়াছে প্রাণ।

সুভাষিতম্

অদ্ভিঃ সর্বাণি ভূতানি জীবন্তি প্রভবন্তি চ।

তস্মাদ্ সর্বেষু দানেষু তয়োদানং বিশিষ্যতে।। (মহাভারত, শান্তিপর্ব)

জল থেকেই বিশ্বের সমস্ত প্রাণীকুল উৎপন্ন হয়েছে। সেজন্য জলকে সর্বোত্তম দান বলা হয়।

‘শেষের সেদিন বড়ো ভয়ংকর’

মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি আর শাসকের মৃত্যুঘণ্টা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মনে হচ্ছে তদন্ত সংস্থাগুলি এই রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। মাস্টার মাইন্ড আর সর্দারকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাই নজর ঘোরাতে বালাসোরের মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনা নিয়ে নিকৃষ্টতম রাজনীতি চালু করেছে এ রাজ্যের শাসক গোষ্ঠী। শাসক বলছে এটা রাজনীতির সময় নয়। তবে তার সঙ্গে যা জুড়ে দিচ্ছে তা নোংরা পোস্টমর্টেম রাজনীতি ছাড়া কিছু নয়। রেল বাজেট বা রেল ভবন তুলে দেওয়ার প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে ওড়িশার রেল দুর্ঘটনা কীভাবে প্রাসঙ্গিক? আসলে এই রাজ্যের দুর্নীতি বিরোধী আগুন শাসকের ঘরের দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছে। দগ্ধ হওয়া থেকে সে পরিবারের কারও রেহাই নেই। তাই মৃত্যু নিয়ে নিকৃষ্ট আর নিম্নরুচির রাজনীতি করতে পিছপা নয় শাসক। ডুবন্তরা খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। শাসকের মৃত্যুঘণ্টা বেজে গিয়েছে।

আওয়াজ থামাতে শাসক তাই মৃত্যু নিয়েও রাজনীতি শুরু করেছে। রাজা রামমোহন রায়ের কথা ধার করেই শুরু করলাম। ‘শেষের সেদিন বড়ো ভয়ংকর। অনেকে বাক্য কবে তুমি রবে নিরুত্তর।’ এর অর্থ এ রাজ্যের দুর্নীতিবাজদের সমূল বিনাশ। অনেকেই দাবি করছেন তৃণমূল সরকারের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে তার ফয়সালা হয়ে যাবে। তবে তার আগে এ রাজ্যে কিছু ঘটনা ঘটতে পারে যা রাজ্যের মানুষ কল্পনা করেন। কিন্তু মানতে পারেন না। কারও দাবি মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির দায়ে হয়তো জেলে যাবেন। কেউ ভাবছেন রাজনৈতিক সমঝোতা করে তিনি নিস্তার পেয়ে যাবেন। রাজনীতিতে চোরাগলি আর কানাগলি রয়েছে। অভিষেকবাবু তেমন একটি কানাগলিতে ঢুকে পড়েছেন। তাঁর এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ গ্রেপ্তার হয়েছেন।

বকলমে তিনি ছিলেন তৃণমূলের খাজাঞ্চি বা অ্যাকাউন্টান্ট। বেশ কয়েকটি ভুয়ো আর বেআইনি সংস্থার হদিশ মিলেছে। দল আর নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানাতেই ২০০৯ সালে সংস্থা তৈরি করা হয়। অনেকে বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মদতেই তাদের এই দুর্নীতির বোলবোলা। হয়তো ম্যানেজমেন্ট শিক্ষিত (বিতর্কিত) অভিষেককে সামনে রেখেই মমতা তাঁর দল চালানোর অর্থ জোগাড় করতে চেয়েছিলেন। মমতা জানিয়েছিলেন দল চালানোর জন্য নির্বাচনী ট্রাস্ট ফান্ড থেকে অর্থ নেওয়ার তিনি বিরোধী। মমতাকে সমর্থন আর সাহায্য করা ছাড়া অভিষেকের অন্য কোনো রাজনৈতিক যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নেই। ন্যূনতম ছাত্র-রাজনীতি অভিষেক কোনোদিন করেননি। ফলে ৩৬ বছর বয়সেও অভিষেক রাজনৈতিক ভাবে অপরিণত থেকে গিয়েছেন। জনসমাবেশে বা সাংবাদিক সম্মেলনে উষ্মার প্রকাশ তার উদাহরণ।

> **মৃত্যু নিয়ে যে জঘন্য রাজনীতি এ রাজ্যের শাসক শুরু করেছে তা অবসানের প্রয়োজন রয়েছে। মৃত্যুঘণ্টার আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছেছে বলেই হয়তো জীবনের শেষ সোপান মৃত্যুকে ধরে বেঁচে থাকার নিম্নতম রাজনীতি তারা করছেন।**

সম্প্রতি রাজনৈতিক ভারসাম্য হারিয়ে তিনি রাজ্যের কুড়মি জনজাতিকে হুমকিও দিয়েছেন। আগুন নেভাতে গিয়ে আগুন জ্বালিয়েছেন। এর আগে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কপালে গুলি করতে। অভিষেকের বিরুদ্ধে একসঙ্গে ৬টি দুর্নীতি মামলার তদন্ত চলছে। চড়া সুরে মোকাবিলার চেষ্টা করলেও জনমানসে তার হতাশা ও ভয় ধরা পড়ে যাচ্ছে। নিজেকে হাসির খোরাক বানিয়ে ফেলছেন। বালাসোরে মর্মান্তিক ট্রেন বিপর্যয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাস্যকার সমালোচনা করেছেন। অপ্রাসঙ্গিকভাবে নোটবন্দির উদাহরণ টেনেছেন।

আমি জানি না মমতা বুঝতে পারছেন কি না যে অভিষেকবাবু কোনোভাবেই তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি নন। তাঁকে সামনে রাখায় দলের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে কি না। মমতার দলে অনেক অভিষেক বিরোধী রয়েছেন। অভিষেক বেকায়দায় পড়ায় তারা উদ্বাহু হয়েছেন। হয়তো মমতার দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অভিষেকবাবু রাজ্যজুড়ে একটি অসাধু চক্রের জন্ম দেন। মন্ত্রী, আমলা, শিক্ষক থেকে শুরু করে মুদি দোকানের কারবারিকে পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। আপাতত মৃত্যু নিয়ে যে জঘন্য রাজনীতি এ রাজ্যের শাসক শুরু করেছে তা অবসানের প্রয়োজন রয়েছে। মৃত্যুঘণ্টার আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছেছে বলেই হয়তো জীবনের শেষ সোপান মৃত্যুকে ধরে বেঁচে থাকার নিম্নতম রাজনীতি তারা করছেন। আমি তাঁদের সম্মিলিত রাজনৈতিক আত্মার শান্তি কামনা করি। ধিক্কার জানিয়ে বলি, ছিঃ। □

সোনা বউমা ও পিসি শাশুড়ি

শাশুড়িষু দিদি,

আমি না জানি না। ভাইপো তো আপনাকে প্রকাশ্যে 'দিদি' বলে ডাকেন। বউমাও কি তাই! বিদেশি বউমা তো, আমি ঠিক চিনিও না। আচ্ছা, আপনাকে পিসিমা বলেন? আমি বরং, সোনা বউমা বলেই ডাকি। না, না দিদি সোনা পাচার কতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন বলে নয়। আসলে বাঙ্গালি পরিবারে আদরের বউমাদের 'সোনা বউমা' বলে ডাকার চল। সেই কারণেই। যদি বিমানবন্দরের সোনার কথা টানতাম তবে তো কয়লা, বালি সবই বউমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে যেত। কিন্তু না, ঘরের লক্ষ্মীকে নিয়ে ও সব কথা বলা ঠিক নয়। যতই বিদেশি ব্যাংকে কাড়ি কাড়ি টাকা থাকুক কিংবা বিদেশে পাচারের অভিযোগ থাকুক।

আপনি যখন বলছিলেন যে, দুবাই যাওয়ার পথে ওঁকে বিমানবন্দরে আটকে দিয়ে অভিবাসন দপ্তর ঠিক কাজ করেনি তখন আমি ভাবছিলাম ঠিকই কথা। পরে আবার ভাবলাম, কারও নামে লুক-আউট নোটিশ থাকলে তাঁকে তো আটকাতেই হয়। অভিবাসন দপ্তরের কর্মীদের কর্তব্যও তো পালন করতে হবে। ইডি ডেকেছে বলে কথা।

তবে দিদি আমার একটা অন্য খটকা লাগছে। 'কালীঘাটের কাকু'-কে আপনি কি চিনতেন? ভাইপো তো বলেছেন চিনতাম না। অথচ কাকু বলছেন আমার সাহেবকে কেউ ধরতে পারবে না। ব্যাপারটা কী বলুন তো! আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে নয়, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আপনিই তো মাথা। আপনার তো সবটা জানা উচিত। কিন্তু দেখুন আপনাকেই জানায়নি যে বউমা একটা কোম্পানির মাথা। সেই কোম্পানিতে আরও দুই মাথা বউমার অরিজিনাল শ্বশুর ও শাশুড়ি। আবার সেই কোম্পানিরই ডিরেক্টর ভদ্র কাকু।

বুঝতে পারছেন না! আচ্ছা আমি বুঝিয়ে বলছি। নথি তো সব প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। তদন্তকারীদের কাছে তো আছেই এমনিতেও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেড' নামে সংস্থায় ডিরেক্টর পদে ছিলেন সুজয়কৃষ্ণ মানে কাকু। সেই সংস্থার বাকি ডিরেক্টররা হলেন অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাইপোর বাবা), বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (আমি ঠিক চিনি না), লতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাইপোর মা), রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাইপোর স্ত্রী)। এই ভদ্রকাকু নিয়োগ দুর্নীতির টাকা নিয়ে এই কোম্পানিতে খাটাতেন। তবে তো চাকরি বিক্রিতেও কি বউমা জড়িয়ে যাবেন? চিন্তা হচ্ছে দিদি, চিন্তা হচ্ছে। একটা সময়ে ওই সংস্থার মাথায় ভাইপোও ছিলেন শুনছি। তিনি নাকি একটা সময়ে ছেড়ে দেন। কিন্তু তাতেও কি দোষ খণ্ডন হয়? জানি না দিদি। জানি না। আর জানি না বলেই আমার বড্ড চিন্তা হয়। বড্ড চিন্তা দিদি, বড্ড।

কাকুর নাকি ৫০টির বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আরও অনেক কিছু। প্রোমোটারি। সবাই বলছে কাকু নাকি কান। আর সেটায় টান পড়েছে। এর পরে মাথা আসতে পারে।

কালীঘাটের কাকুর উত্থানের গল্প ঠিক কীরকম? নৌ বাহিনীর ডি গ্রুপের কর্মী থেকে কোটি কোটি টাকার মালিক হন কালীঘাটের কাকু। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে উঠে এসেছে সেই তথ্য। কীভাবে তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক হবেন? কাকু প্রথমে নৌবাহিনীতে ছিলেন। সেখানে নাকি তাঁকে জুতো পালিশ করতে হতো। তাই সেই চাকরি তিনি ছেড়ে দেন। তারপরে ছোটোকাটো কোম্পানিতে কাজ করতে করতে বাড়িতেই মুদিখানার দোকান। অনেক পরে রাজনীতিতে আসা। সেখান থেকে শুরু প্রোমোটিঙের ধান্দা। এমনটাই দাবি কাকুর ঘনিষ্ঠ মহলের। রাজনীতিতে আসার পর তাঁর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সখ্য। অভিষেককে তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন বলে এই কথা তিনি নিজেই বারবার দাবি করে এসেছেন। বিরোধী নেতারা বলছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র অভিষেকের কোম্পানিতে ডিরেক্টরপদে ছিলেন। যদিও সেই বিতর্কিত লিপস অ্যান্ড বাউন্ড কোম্পানিতে অনেক দিন আগেই তার মালিকানা ছেড়ে দিয়েছেন অভিষেক।

এখানেই শেষ নয়। এখন তো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে কাকুর নাকি ৫০টির বেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। আরও অনেক কিছু। প্রোমোটারি। সবাই বলছে কাকু নাকি কান। আর সেটায় টান পড়েছে। এর পরে মাথা আসতে পারে।

চিন্তা নয়, ভয় করথে পিসি। সরি দিদি। আসলে পিসি হিসেবেই তো বিপদটা। কিন্তু আগেই বলে রাখাছি, আপনার ভাই বলে আমি কিন্তু 'কাকু' নই। একেবারেই নই। □

অতিথি কলম

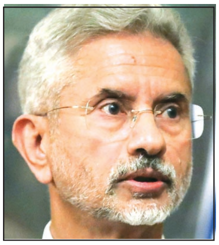

এস. জয়শঙ্কর

ন'টি বছরের অতিক্রমন একটি অবিশ্বাস্য পদচিহ্ন

মোদী সরকারের নবম বর্ষপুর্তিতে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর সুচিন্তিত বিশ্লেষণে জানাচ্ছেন--- আজকের ভারতের আন্তর্জাতিক কূটনীতি অনেক বেশি প্রভাবশালী এবং বিশ্বপটভূমিতে অত্যন্ত পরিশিলীত এক ধারা। বলতেই হবে ৯ বছরের কার্যকালে এই নীতির প্রয়োগ একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সারা বিশ্বই ক্রমাগত এই নীতির অভিঘাতকে প্রশংসা করছে এবং ভারতের অভ্যন্তরেও মানুষ গর্ব বোধ করছে। সকলে প্রত্যক্ষ করতে পারছেন সরকারের নেইবারহুড ফার্স্ট ও সাগর গোষ্ঠীর নীতিগত সিদ্ধান্ত। কোয়াড-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সৌরশক্তি বৃদ্ধির জোটের অন্যতম। ভারতকে অন্য দেশগুলি প্রথমেই মেনে নিচ্ছে একজন সর্বদা প্রত্যয়ী অংশীদার হিসেবে যে উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এই ধরনের প্রচেষ্টায় ভারতই সবার আগে সাড়া দেবে এটা একটা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বের এই ধরনের আচরণ প্রমাণ করে যে ভবিষ্যতে একটি প্রধান শক্তি হয়ে ওঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভারতের রয়েছে।

ভারতের উর্ধ্বগতি একটি অনিশ্চিত ও টালমাটাল বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। আমাদের সময় এই ঝড়ঝাপটাপূর্ণ পরিস্থিতিকে শুধু ম্যানেজ করলেই হবে না যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাড়তি ব্যবস্থাও নিতে হবে। বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকালেই দেখা যায় যে চলতি সংঘর্ষগুলি চলছে সেখানে বড়ো শক্তিধর দেশগুলিই সর্বদা পরিস্থিতিকে বৃহত্তরভাবে নিজেদের সুবিধের দিকে নিয়ে যেতে চায়। তারাই বরাবরের মতো প্রভু থাকতে চায়। এই উদ্ভূত অবস্থায় নিজেদের অবস্থান ভারত কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বদা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করে নিয়েছে। শক্তিধরদের প্রতিক্রিয়াকে হিসেবের মধ্যে রেখে কোনো মিনমিনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিস্তেজ থাকেনি, দেশের যাতে ভালো হয় একইসঙ্গে স্বার্থ ও মূল্যবোধকে সুরক্ষিত রেখে এগিয়েছে। আমাদের নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তব রূপায়ণ আমরা কোনো বাইরের চাপ ছাড়াই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিয়েছি— এটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব। এই সূত্রে বিগত নয় বছরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী দেশই লক্ষ্য করেছে যে মূলগতভাবে ভারতীয় প্রশাসন আমূল বদলে গেছে। কিন্তু অংশীদারদের এত গুণগত পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে থাকতে কোনো অসুবিধে হয়নি। কারণ সিদ্ধান্ত ও কাজের ধারা ছিল সর্বদাই সদর্থক ও সকলকে নিয়ে।

এই সূত্রে কোভিডের বিশ্ব মহামারী ছিল শক্তিমান ও পরিবর্তনসক্ষম এক ভয়াবহ আক্রমণ। এই সময় বোঝা যায় অর্থনীতির সাফল্য নির্দিষ্ট দেশ সাপেক্ষে কেন্দ্রীয়ভূত হলে তা কত সহজেই ভেঙে পড়তে পারে। বিশ্বায়ন নিমেষে কীভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। এই সরবরাহ শৃঙ্খল ঠিকমতো কার্যকর রেখে এত বড়ো ধ্বংসাত্মক মহামারীর হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে সরকার কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তা বোঝা যায়। এই বিষয়ে ভারত নির্দিষ্টভাবে লক্ষ নিশ্চিত করে মেক ইন ইন্ডিয়া, পিএলআই প্রকল্পগুলি বাড়তিভাবে সচল রাখাও গতি শক্তি প্রকল্পকে শক্তিমান করার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিদেশনীতি জোর দিয়েছিল আন্তর্জাতিক সুযোগের সদ্ব্যবহারের ওপর। একই সঙ্গে 'মেক ইন ইন্ডিয়ার' মাধ্যমে নিজেদের বিনিময় যোগ্য বস্তুর উৎপাদন বাড়ানো এবং সেটা করতে গিয়ে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও আবিষ্কারকে প্রয়োজনানুযায়ী গ্রহণ করা। এর চূড়ান্ত পরিণতি দেশে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি পাওয়া।

আমাদের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ দেশে অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনছে। দুরূহ ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি দেশের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শক্তিক্ষেত্র, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে শিক্ষার জগতে 'নলেজ ইকনমি' নামে নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে। জ্ঞানের পরিধি ভারতীয় ছেলে-মেয়েরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছেন। ভারতীয় প্রতিভা আজ প্রবল শক্তিশালী অস্ত্র। আন্তর্জাতিক ক্ষমতাবলয়ের মধ্যে সফলভাবে লড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের এই বিশেষ প্রযুক্তিগত জ্ঞান অনেক সুবিধে দিচ্ছে। সমগ্র বিশ্বকে একটি কর্মক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে গমনাগমন সম্পর্কিত বহু চুক্তি সম্পাদন করেছে। এর উদ্দেশ্য যাতে আমাদের পেশাদর কর্মীরা উপযুক্ত সুবিধে পায় এবং সেখানে কোনো সময় আপদকালীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তাদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা যায়। 'বন্দে ভারত মিশন' ও 'অপারেশন গঙ্গা ও কাবেরি' এই প্রসঙ্গে দুটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

ভারত আজ বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ। একইসঙ্গে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি যা ক্রমশ আরও বৃদ্ধির পথে চলেছে। কিন্তু ভারতের নজরকাড়া প্রভাব তৈরি হচ্ছে আমাদের নতুন মৌলিক ভাবনা

ও প্রয়াসে সাফল্যের কারণে। উদাহরণস্বরূপ তা জলবায়ু নিরীক্ষণ বা সন্ত্রাসবাদ দমন, যোগাযোগ ব্যবস্থা বা নৌপথের নিরাপত্তা বৃদ্ধি কিংবা অর্থনৈতিকভাবে সামগ্রিক জনগণকে ক্ষমতাশালী (financial inclusion) করে তোলা ও খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার মতো বিষয় রয়েছে। এই বিষয়ে ভারতে প্রয়োজনীয় দেশগুলির সঙ্গে মত বিনিময় করেছে এবং সাফল্য পেয়েছে। ভারত বিশ্বকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে নিজের নীতি ও তার সফল প্রয়োগকেই উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছে।

গণবণ্টন ক্ষেত্রে (ration বা subsidy) যখন আমরা বজ্রকঠিন নিয়ন্ত্রণ জারি করে চুরি আটকে দিতে পারি, renewable energy ক্ষেত্রে সফলভাবে এগোতে পারি এবং সর্বোপরি বিপুল পরিমাণ টিকা কঠিনতম সময়ে সফল উৎপাদন ঘটিয়ে একটি অসাধারণ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে পারি তখন এগুলিই সারা বিশ্ববাসীর কাছে এক অসাধারণ গ্রহণযোগ্য উদাহরণ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সকলের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার যে সদিচ্ছা, আগ্রহ যা ছিল বিরল টিকার উৎপাদনের পর তা বিশ্ববাসীকে অবাক করে দেয়। 'ভ্যাকসিন মৈত্রী' যা বিশ্বের ১০০টি দেশের কাছে আমাদেরই ত্রাতা হিসেবে পরিগণিত করে। একইসঙ্গে এক দীর্ঘস্থায়ী দুর্লভ মৈত্রীতার জন্ম দেয় যা ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। জেনে রাখা দরকার, ৬০০টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প ৭৮টি দেশের সঙ্গে চলছে যা আমাদের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা ও ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত করেছে। ভুলে যাবেন না প্রাকৃতিক ভূমিকম্পের সময় ভারতের ভূমিকা প্রমাণ করেছিল বাস্তবে আমাদের দেশের ক্ষমতা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার সংখ্যায় বৃদ্ধি, পরিসর ও বিষয় বৃদ্ধি আমাদের সহযোগী দেশগুলি সানন্দে মেনে নিয়েছে। সামুদ্রিক অঞ্চলে শ্রীলঙ্কা, অন্যদিকে নেপাল অন্যদিকে তেল সংক্রান্ত উপসাগরীয় অঞ্চলে বা আফ্রিকাতে একইসঙ্গে ইউরোপ বা ল্যাটিন আমেকিাতেও আমাদের প্রভাব বেড়েছে।

বিদেশনীতি সবসময়ই নিজেদের সীমান্ত দিয়েই শুরু হয়। আর এখানেই এসেছে সর্ববৃহৎ সংস্কার। অত্যন্ত উদার এবং প্রতিপক্ষ সেভাবে সদুত্তর ছিল কিনা তা না দেখেও অসাধারণ অবস্থান নেওয়া বহু ক্ষেত্রে সাফল্য এনে দিয়েছে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্ষেত্রে নতুন রাস্তায় যোগাযোগ, রেলপথ ও নদীপথ ব্যবহারে যোগাযোগ বৃদ্ধি, তেলের পাইপ লাইন আনা ও সীমান্ত পারাপারের সুবিধে তৈরি করে অন্য দেশের দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে দিয়েছে। অবশ্যই কোভিডের সময় যে যৌথ সাড়া দেওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তাই পরবর্তীকালে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটে ভারতের সেদেশের পাশে দাঁড়ানো চিরস্থায়ী দাগ ফেলেছে।

২০১৪ সালের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করার সময় তিনি সাহসী বিদেশনীতির প্রতি দায়বদ্ধতার কথা বলেছিলেন যা দ্বিধাগ্রস্ততাকে গ্রাহ্য করবে না, একইসঙ্গে কোনো দীর্ঘ অনুসৃত স্থবির নীতিও মানবে না। সেই পথেই তিনি আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণের দায় নিয়ে চলমান সময়ে সজাগ থাকার কথা বলছেন। আমরা সেই প্রতিশ্রুতির সাফল্যের অঙ্গীকারেই ১০ বছরে প্রবেশ করছি।

(লেখক ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

১৫ জুন, ২০২৩ থেকে অনলাইনে ওই টাকা পাঠানো যাবে। অনলাইনে টাকা পাঠালে নিচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—

শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১

শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

***অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details*—**

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

কেরালা স্টোরির বাস্তবতার প্রমাণ মিললো জব্বলপুরে

দ্য কেরালা স্টোরি গল্পে এবার যেন বাস্তবতার ছোঁয়া। এখানে দেখানো হয়েছিল কেরালায় হাজার হাজার অমুসলমান মহিলাকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে ইসলামিক স্টেট নামক জঙ্গিগোষ্ঠীতে জেহাদি কাজকর্মে বা জেহাদিদের যৌনদাসী করে পাঠানো হয়েছে। ছবিটি মুক্তি পেয়েছে দু'মাসও হয়নি, এর মধ্যে গোটা দেশ জুড়ে চলচ্চিত্রটি নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু কেরালা স্টোরিতে বর্ণিত কাহিনি যে স্রেফ কষ্টকল্পনা নয়, বরং ঘোর বাস্তব তা উঠে এল মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে ঘটনায়। সূত্রের খবর, গত ২৬ ও ২৭ মে জব্বলপুরের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ জেহাদি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগে সৈয়দ মামুর আলি, মহম্মদ আদিল খান, মহম্মদ শাহিদ নামে তিন মুসলমান যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। এনআইএ সূত্রের খবর, আদিল খানের ওপর গত একবছর যাবৎ গোয়েন্দারা কড়া নজর রেখেছিলেন। কারণ সে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামিক স্টেট নামক জঙ্গি সংগঠনের মতাদর্শ প্রচার করতো।

এভাবেই ভারতের বিভিন্ন এলাকার মুসলমান যুবক-যুবতীদের মাথায় আইএসের মতাদর্শ গেঁথে দিয়ে তাদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে প্ররোচিত করতো বলে আদিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মের বাইরেও বিভিন্ন এলাকার সক্রিয় ভাবে ইসলামিক জেহাদি আদর্শের প্রচার থেমে থাকেনি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের বাইরেও বিভিন্ন এলাকার সক্রিয় ভাবে ইসলামিক জেহাদি আদর্শের প্রচার অর্থাৎ 'দাওয়াহ' করতো সে। জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে খবর এসেছিল, আদিল তার দলবল নিয়ে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন মসজিদে ও মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় গোপন মিটিং করে ভারতে আইএসের জাল বিস্তার ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ছড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এরপরেই এনআইএ অ্যাকশানের পরিকল্পনা নেয়। ধৃতদের জেরা করে জানা গেছে, ভারতে আইএস মডিউলের সক্রিয় কর্মী তারা। আইএসের এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতো তারা। অনেক যুবক-যুবতীকে তারা আইএসে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে ব্যবহারও করেছে তারা বলে জেরায় জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে এবছরের জানুয়ারির শেষে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল জঙ্গি সন্দেহে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা যথাক্রমে খালিদ মুবারক খান ও আব্দুল্লাহ নামক দুই মুসলমান যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাদের জেরায় জানা গিয়েছিল, পাকিস্তান গিয়ে জেহাদি প্রশিক্ষণ নেওয়ার পকিল্পনা ছিল তাদের। দিল্লি থেকে কাশ্মীর হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করার পরিকল্পনা করেছিল তারা। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, পাকিস্তানে যে জেহাদি গোষ্ঠীগুলি সচল আছে তারা প্রশিক্ষণের পরই ভারত জঙ্গি অনুপ্রবেশ করিয়ে এখানে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালায়।

> **আইএসের ধাত্রীভূমি ইরাক ও সিরিয়ায় আইএস খুব দ্রুত তাদের পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে। বাধ্য হয়ে নতুন জমি খোঁজার জন্য তাদের ভারত ও সন্নিহিত অঞ্চলকে বেছে নিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ভরসা সেই লাভ-জেহাদই খানিক নতুন রূপে।**

খালিদ ও আব্দুল্লাহের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হতো না বলে গোয়েন্দাদের অনুমান। গোয়েন্দারা বিভিন্ন ঘটনায় লক্ষ্য করে দেখেছেন, বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে জেহাদিরা এই মাধ্যমটিকে বেছে নিয়েছে তাদের সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক বিস্তারের কাজে। উপর্যুপরি একাধিক ঘটনায় গোয়েন্দারা তার প্রমাণ পেয়েছেন।

কেরালায় লাভ-জেহাদ নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন অনেকদিন যাবৎই সরব। দ্য কেরালা স্টোরির পরিচালক সুদীপ্ত সেন জানিয়েছেন, বছর দশকে আগে কেরালার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উমেন চন্ডি বিধানসভায় এক পরিসংখ্যান পেশ করে জানান, প্রতি বছর সে রাজ্যে প্রায় ৩২০০ অমুসলমান রমণী লাভ-জেহাদের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করছে। তাদের যে দেশ-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে ব্যবহার করা হয়, তা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে একপক্ষ তাদের রাজনীতির স্বার্থে, মুসলমান ভোটব্যাংকের স্বার্থে ইসলামিক সন্ত্রাসে লাভজেহাদের ভূমিকাকেই অস্বীকার করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্র দ্য কেরালা স্টোরি নিয়েও বহু বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু কেরালা স্টোরির বাস্তব ভিত্তির প্রমাণ দিচ্ছে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর, কিংবা তারও আগে দিল্লির ঘটনা।

সবমিলিয়ে পরিস্থিতি যে গভীর উদ্বেগজনক তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আইএসের ধাত্রীভূমি ইরাক ও সিরিয়ায় আইএস খুব দ্রুত তাদের পায়ের তলার মাটি হারাচ্ছে। বাধ্য হয়ে নতুন জমি খোঁজার জন্য তাদের ভারত ও সন্নিহিত অঞ্চলকে বেছে নিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ভরসা সেই লাভ-জেহাদই খানিক নতুন রূপে। শুধু তাই নয়, বিদেশে বসবাসরত ভারতীয় বংশোদ্ভূতদেরও আইএস টার্গেট করছে। এ বছরের জানুয়ারিতেই এক বাংলাদেশি ব্রিটেনে পড়াশোনা করা ছাত্রী শামিমা বেগমের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে যে আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার জন্য সিরিয়া পর্যন্ত গেছিল। ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্যও এই প্রবণতা অত্যন্ত বিপজ্জনক। □

নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন হওয়ায় দেশবাসী আনন্দিত এবং গর্বিত

মণীন্দ্রনাথ সাহা

উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করা হলো স্বাধীন দেশের নিজস্ব সংসদ ভবন। সৃষ্টি হলো এক নতুন ইতিহাস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন হলো ২৮ মে সকালে। আর সেই গণতন্ত্রের মন্দিরের উদ্বোধন হলো প্রধানমন্ত্রীর হাতেই।

সেদিন সকালে সওয়া সাতটা নাগাদ অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিশিষ্টজনেরা। উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের আগে শুরু হয় পুজোপাঠ। সর্বধর্ম প্রার্থনা সভাও হয়। পুজোপাঠ শেষে নতুন সংসদ ভবনে স্বর্ণদণ্ড 'সেঙ্গল' স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সময় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে কাছে ডেকে নেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন 'সেঙ্গল'কে। সেঙ্গল স্থাপনের পর সেখানে উপস্থিত ধর্মগুরুদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নেন তিনি। এরপর, যে সমস্ত শ্রমিক এতদিন ধরে এই ভবন নির্মাণ করেছেন, তাঁদের অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী। তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে 'সেঙ্গল' তুলে দেন তামিলনাড়ুর মঠের সন্ন্যাসীরা। লোকসভার স্পিকারে আসনের পাশেই সেটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশ করার সময় প্রধানমন্ত্রী ঐতিহাসিক 'সেঙ্গল' হাতে নিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, 'প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জয়যাত্রার মধ্যে কিছু কিছু মুহূর্ত অমর হয়ে থেকে যায়। তার মধ্যে ২৮ মে তারিখটাও থেকে যাবে। নতুন সংসদ ভবন শুধু একটি ভবনই নয়, এটি ১৪০ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়। এটা গোটা বিশ্বকে ভারতের সংকল্পের বার্তা পৌঁছে দেয়।' তিনি আরও বলেন, 'বহু বছরের বিদেশি শাসন আমাদের গর্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল। আজ তা অতীত। এই সংসদ ভবন আত্মনির্ভর ভারতের প্রমাণ। বিকশিত ভারতের দিকে যাত্রার সাক্ষী। আজ যে সেঙ্গল সংসদ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হলো, সেটি চোল সাম্রাজ্যে কর্তব্যপথ, সেবাপথ, রাষ্ট্রপথ হিসেবে স্বীকৃতি ছিল। এই পবিত্র বস্তু ন্যায়বিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও সুশাসনের প্রতীক। লোকসভা কক্ষের কর্মকাণ্ড শুরু হলেই সেঙ্গল আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

তিনি বলেন, 'বহু বছরের বিদেশি শাসন আমাদের গর্বকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আজ সেই ঔপনিবেশিক ভাবনা সরিয়ে দিয়েছে নতুন ভারত। এটি একটি বিকশিত ভারত। ভারত যখন উন্নতি করে তখন গোটা বিশ্ব সেই উন্নয়নের সঙ্গী হয়। নতুন সংসদ ভারতের উন্নয়নের বৃদ্ধির গতি বাড়াবে। যা আগামী দিনে গোটা বিশ্বের উন্নয়নে অবদান রাখবে।'

নরেন্দ্র মোদীর যে কোনো কাজে বিরোধীদের বিতর্ক ও অসহযোগিতা করাই কাজ। সেদিক দিয়ে দেখলে মোদী নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করবেন আর বিতর্ক হবে না তাই হয় নাকি? সেকারণে এই ঐতিহাসিক দিনে কংগ্রেস, আমআদমি পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, এনসিপি, শিবসেনা, ডিএমকে, বামেরা-সহ উনিশটি বিরোধী দল সংসদ ভবনের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিল। কয়েকদিন আগেই তারা প্রধানমন্ত্রীর নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের বিরোধিতা করেছিল। তারা প্রশ্ন তুলেছিল, সংসদের প্রধান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁকে দিয়ে কেন ভবন উদ্বোধন করানো হবে না এবং তাঁকে কেন এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলো না? প্রতিবাদে এই উনিশটি বিরোধীদল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদিও কেন্দ্রের তরফে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বিরোধীদের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তবুও বিরোধী দলগুলি বয়কটের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল।

> **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন পার্লামেন্ট ভবনে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর সেঙ্গল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনলেন প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাস।**

অথচ কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি ভুলে গিয়েছে যে, ১৯৭৮ সালের ২৪ অক্টোবর পুরনো পার্লামেন্টের অ্যাসেক্স ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, রাষ্ট্রপতি নন। আবার ১৯৮৭ সালের ১৫ আগস্ট সংসদের লাইব্রেরির উদ্বোধন করেছিলেন সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। তাহলে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করলে এই সমস্ত বিরোধী দলের আপত্তি থাকবে কেন? তবে বিজেপি বিরোধীদের মধ্যে আবার বিজেডি, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, তেলুগুদেশম, বিএসপি, শিরোমণি অকালি দলের নেতারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, তারা নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন।

ফঃ ২

নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী কেন করবেন, এই প্রশ্ন যখন কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা তুলেছিল, ঠিক তখনই কংগ্রেস নেতা প্রমোদ কৃষ্ণণ রীতিমতো বোমা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'নতুন সংসদ ভবন নিয়ে এত বিতর্ক কেন হচ্ছে? ভারতের সংসদ বিজেপির সম্পত্তি নয়। এটা সবাইকে বুঝতে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের সংসদ ভবন উদ্বোধন না করলে কে করবেন? ভারতের প্রধানমন্ত্রী না করলে দেশের সংসদ ভবনের উদ্বোধন কি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করবেন? নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু দেশের বিরোধিতা করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। বিরোধীদের কাছে তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন করছি।' স্বাভাবিক ভাবেই প্রমোদের এই বক্তব্যে বেশ বিপাকে পড়েছিল কংগ্রেস। বিজেডি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছিল গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে সংসদ রাজনীতির উর্ধ্বে। তার মর্যাদা সর্বদা রক্ষা করা উচিত। সংসদের পবিত্রতা নষ্ট হয় এমন কোনও কাজ কারও করা উচিত নয়। সমস্যা হলে তা সংসদের ভিতরেই আলোচনা করে সবার মিটিয়ে ফেলা উচিত।

এবার বিরোধীদের ভণ্ডামিটা একটু দেখে নেওয়া যাক। যে রাষ্টপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে দিয়ে নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন না করার জন্য আজ যারা ব্যথায় কাতর, সেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতি সহানুভুতি সেদিন ওদের কোথায় ছিল? সেদিন তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীরা প্রার্থী এবং ভোট দিয়েছিল? অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রশাসনিক ভবন নবান্নের উদ্বোধন কি তৎকালীন রাজ্যপালকে দিয়ে করানো হয়েছিল? এই তৃণমূল মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, রাজ্যপাল নয়, রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হবেন মুখ্যমন্ত্রী। অতীত কী বলে? আরও জেনে রাখুন-- ২০১৪-তে অসম ও ঝাড়খণ্ডে, ২০১৮-তে অন্ধ্রপ্রদেশে, ২০২০-তে ছত্তিশগড়ে, ২০২৩-এ তেলেঙ্গানায় নতুন বিধানসভা ভবনের শিলান্যাস কোনো রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজ্যপাল করেননি বা না প্রধানমন্ত্রী, না মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধন করেছিলেন সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধী। তাহলে কি ধরে নিতে হবে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির চেয়েও ওনারা বেশি সম্মাননীয় ছিলেন? এইসব নিলজ্জদের লজ্জা দেবে কে?

নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের আগে কাশ্মীরের নেতা গুলাম নবি আজাদ বলেছেন, 'বয়কটের প্রশ্নই নেই। বরং রেকর্ড সময়ে নতুন সংসদ ভবনের কাজ শেষ করার জন্য বিজেপি সরকারকে অভিনন্দন জানানো উচিত বিরোধীদের। তাঁর দল নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করছে না।'

আবার নতুন সংসদ ভবন সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলার জন্য আরজেডিকে তোপ দেগেছেন 'মিম' প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়েইসি। তিনি বলেন, 'নতুন সংসদ ভবন নিয়ে কারও আপত্তি থাকতেই পারে। আপত্তি থাকলে সে কথা বলবেন। কিন্তু এভাবে কফিনের সঙ্গে সংসদ ভবনকে তুলনা করা যায় না। এটা একেবারেই সঠিক কাজ নয়।'

সংসদ ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে উনিশটি দল যোগ দেয়নি তাদের মধ্যে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের গায়ে জ্বালা ধরেছে সবচাইতে বেশি। কারণ নরেন্দ্র মোদী এই দুটি দলের নেতাদের লুটেপুটে খাওয়া বন্ধ করে দিলেন সংসদ ভবন নির্মাণ করে। সে জন্যই এই অনুষ্ঠানে তাদের লেজুড় আরও ১৭টি দলকে সঙ্গে নিয়ে তারা অনুপস্থিত থাকলেন।

সবাই জানেন মনোমোহন সিংহ সরকারের শাসনকালে পি চিদাম্বরম দশ বছর মন্ত্রী ছিলেন। যে বাড়িতে থাকতেন, সেই বাড়িটা তাঁর স্ত্রীর নামে ছিল। সেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই থাকতেন। স্ত্রীকে বাড়ির মালিক দেখিয়ে ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা প্রতিমাসে ভাড়া নিতেন।

নতুন সংসদ ভবন নির্মাণ হয়েছে 'সেন্ট্রালভিস্তা' প্রকল্পের মাধ্যমে। ভারত সরকারের প্রায় ৪০টা মন্ত্রক ভাড়া বাড়িতে আছে। এক একটা বাড়ির ভাড়া বছরে প্রায় ১২ থেকে ১৫ কোটি টাকা। আর সব ভাড়া বাড়ির মালিক কংগ্রেস বা বামপন্থী নেতারা। এই জন্যই নতুন সংসদ ভবনের বিরোধিতা করছেন তারা। কারণ নতুন সংসদ ভবন চালু হলে ওই সমস্ত ভাড়াবাড়ি থেকে সব মন্ত্রক সেন্ট্রাল ভিস্তাতে স্থানান্তরিত হবে, আর কংগ্রেস ও বামপন্থীদের ভাড়া বন্ধ হয়ে যাবে। এই নতুন সংসদ ভবনের জন্য ৯৭৫ কোটি টাকা আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছিল। কিন্তু খরচ হয়েছে ৯৭১ কোটি টাকা। এদিকে প্রায় ৪০টা মন্ত্রকের ভাড়া বছরে ৫০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ দুই বছরের ভাড়ার টাকায় নতুন সংসদ ভবন তৈরি কারা হলো।

এই জন্যই কংগ্রেস সেন্ট্রাল ভিস্তা নির্মানের কাজ বন্ধ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে ছিল কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। উপরন্তু ওই আবেদনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করেছিল এবং কঠোর ভর্ৎসনা করেছিল আবেদনকারীকে।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণের প্রতীক হিসেবে চোল রাজবংশের ন্যায়দণ্ড সেঙ্গলকে হিন্দু ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তারপর সেই ন্যায়দণ্ডের স্থান হয়েছিল এলাহাবাদে নেহরু-গান্ধী পরিবারের নিজস্ব জাদুঘরে। সেঙ্গলকে সেখানে সাজিয়ে রেখে তার তলায় লিখে রাখা হয়েছিল— 'পণ্ডিত নেহরুর হাঁটার লাঠি'। সেঙ্গলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব না দিয়ে নেহরু-গান্ধী পরিবারের এই অসম্মানকে ভারতীয়ত্বের অপমান বলেই মনে করেন দেশবাসী।

ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী জানা যায়— 'ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা লাভের সময় চোল রাজাদের মতো একটি রাজদণ্ড 'সেঙ্গল' তৈরি করা হয়। এই সেঙ্গল একজন চোল রাজা তার পরবর্তী রাজাকে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় অর্পণ করতেন। এই সেঙ্গলের ওপর শিবের বাহন নন্দীর একটি ছোটো মূর্তি রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এই জাতীয়সম্পত্তি নেহরুদের এলাহাবাদের বাসভবনে চলে যায়। এবং এত বছর ধরে নেহরু পরিবারের বাসভবনের মিউজিয়ামে রক্ষিত ছিল। আসলে জাতীয় সম্পত্তিকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি ভাবা নেহরু-গান্ধী পরিবারের পুরনো অভ্যাস। উপরন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি তথা সনাতন সংস্কৃতির বিরোধিতা করাও এই পরিবারের পুরনো রোগ। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই সেঙ্গলকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে নতুন সংসদ ভবনে স্থাপন করলেন।

দীর্ঘদিন ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা এই ঐতিহ্যবাহী রাজদণ্ড প্রকাশ্যে আনলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় সরকার, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুনন পার্লামেন্ট ভবনে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর সেঙ্গল প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনলেন প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাস। □

মোদী সরকারের নয় বছর

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কার্যকালের ৯ বছর পূর্ণ করেছেন। এই ৯ বছরে কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট সরকার অনেক মাইলফলক অর্জন করেছে এবং নির্বাচনী সংকল্পপত্রের অনেক প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে।

অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা বাতিল করা

সংকল্পপত্রে বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল এবং ৩৫-এ ধারা বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ২০১৯ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসার তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরকে একটা ও লাদাখকে আরেকটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠন করেছে। তারপর থেকে জম্মু ও কাশ্মীর বিভিন্ন সেক্টরে দ্রুত উন্নয়ন লাভ করেছে।

রামমন্দির ও তীর্থ স্থানের উন্নয়ন

বিজেপি সংকল্পপত্রে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ এবং দেশজুড়ে তীর্থ স্থানগুলির উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির কথা বলেছিল ও সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নয়নও। ৯ নভেম্বর, ২০১৯-এ, সুপ্রিম কোর্ট হিন্দু পক্ষের অনুকূলে রায় দিয়ে হিন্দুদের রামমন্দির নির্মাণের জন্য জমি দিয়েছিল। সময় নষ্ট না করে ভারত সরকার শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট গঠন করে। নির্মাণ তহবিল সংগ্রহের জন্য ট্রাস্ট দ্বারা একটি বিশেষ অনুদান সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হয়েছিল এবং বিশ্বজুড়ে হিন্দুরা এতে অংশ নিয়েছিল। ৫ আগস্ট, ২০২০-তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামমন্দিরের ভূমিপূজন করেন এবং অযোধ্যায় রামমন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে মন্দিরটি জনসাধারণের জন্য উপযুক্ত করা হবে।

উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী পবিত্র স্থান ও অন্যান্য ধর্মীয় স্থানগুলির বিকাশ, সংস্কার এবং পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রকল্প শুরু করেছেন যার মধ্যে কেদারনাথ, কাশী বিশ্বনাথ করিডোর, মহাকাল করিডোর এবং আরও অনেক কিছুর উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বারাণসী থেকে নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় তিনি ওই পবিত্র শহরের উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন।

কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ

প্রধানমন্ত্রী মোদীর দ্বিতীয় মেয়াদে দেশের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটা ছিল কোভিড-১৯ মহামারী যা ২০২০ সালের গোড়ার দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ২০২০-র মার্চে ভারত সরকার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশব্যাপী লকডাউন আরোপের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০২১-এ দ্বিতীয় তরঙ্গ ভারতকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছিল। মহামারীতে পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা গেছে ও হাজার হাজার তাদের জীবিকা হারিয়েছে।

ভারতে টেস্টিং সেন্টার, পর্যাপ্ত আইসিইউ, এমনকী মেড-ইন- ইন্ডিয়া পিপিই কিটও ছিল না। ভারতে যখন মহামারী আঘাত হানে তখন আমরা চীন থেকে পিপিই কিট-সহ প্রচুর পণ্য আমদানি করছিলাম। চীনে মহামারীর উৎপত্তি হওয়ায় এর সরবরাহ চেইন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, সেই সময়ে দেশে মাত্র ২.৭৫ লক্ষ পিপিই কিট ছিল।

অন্য কোনো উৎস খুঁজে বের করার সময় ছিল না এবং ভারত সরকার সঠিক সময়ে তার হাল ধরেছিল। প্রায় শূন্য পিপিই কিট তৈরি থেকে, ভারত আসন্ন মাসগুলিতে এক বিশাল পিপিই উৎপাদনকারী দেশ হয়ে উঠেছে। ভারত সরকার হাসপাতাল, ডাক্তার, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী এবং ফ্রন্টলাইন কর্মীদের পিপিই কিটগুলোর প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধের ভিত্তিতে কাজ করেছে। দেশব্যাপী লকডাউনের দুই মাসের মধ্যে, ভারত তার নিজস্ব পিপিই কিট তৈরি করেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক এবং বস্ত্র মন্ত্রণালয় নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে একসঙ্গে কাজ করেছে। এন ৯৫ মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে। ভারত শুধুমাত্র স্থানীয় বাজারের জন্য সরবরাহ বজায় রাখেনি বরং প্রয়োজনে অন্যান্য দেশগুলিতে পণ্য রপ্তানি করেছে ও উপহার দিয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা খাতে সরবরাহ যাতে ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য সক্ষম মাথারা কাজ করেছিল, বিজ্ঞানীরা ভারতে দেশীয় ভ্যাকসিন তৈরির জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। একই সঙ্গে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট ভ্যাকসিন তৈরি করা শুরু করে। অ্যাস্ট্রা জেনেকা কোভিশিল্ড উদ্ভাবন করেছিল আর ভারত

বায়োটেক করেছিল কোভ্যাকসিন, রেকর্ড সময়ে।

ফাইজারের টিকা দেওয়ার অনুমতির জন্য ভারত সরকারের উপর অনেক চাপ ছিল কিন্তু কোম্পানির আরোপিত শর্তের কারণে ভারত সরকার তা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রিয়েল টাইমে কোভিড-১৯ টিকাদান ড্রাইভ ট্র্যাক করার জন্য ভারত একটি অত্যাধুনিক CoWIN প্ল্যাটফর্মও তৈরি করেছে। ভারতে এখনও পর্যন্ত ২২০.৬৬ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ৯৫.১৯ কোটিরও বেশি মানুষ ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ পেয়েছে এবং ২২ কোটিরও বেশি লোক একটি সতর্কতামূলক তৃতীয় ডোজ পেয়েছে। সারা দেশে এখনও ২৬১টি টিকাদান কেন্দ্র সক্রিয় রয়েছে যার মধ্যে ১৯১টি সরকারি এবং ৭০টি বেসরকারি।

ভারত যে আরেকটি ধাক্কা পেয়েছিল তা হলো কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় মেডিক্যাল অক্সিজেনের অভাব। সরকার এটা থেকে শিক্ষা নিয়ে ২০২১ সলের অক্টোবরের মধ্যে সারা দেশে সরকারি হাসপাতলে প্রায় ২৫০০টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু করেছে।

স্বাস্থ্য খাতে অগ্রগতি

গত নয় বছরে ভারত সরকার দেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। ২০১৪ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী মোদী দায়িত্ব নেন, তখন সেখানে শুধুমাত্র একটি সম্পূর্ণরূপে চালু এইমএস-এর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ব্যাপকভাবে কাজক রেছে যাতে লোকেরা তাদের নিজস্ব রাজ্যে সুলভ মূলে সেরা সেবা পেতে পারে।

বর্তমানে দিল্লি এইমএস ছাড়াও ছয়টি সম্পূর্ণরূপে চালু এইমএস রয়েছে যা হলো ভোপাল, ভুবনেশ্বর, মঙ্গলাগিরি, নাগরপুর, বাঠিন্দা, বিবিনগর, কল্যাণী, দেওঘর, বিলাসপুর ও রাজকোটে। দশটি এইমএস আধা-অপারেশনাল, নির্মাণাধীন এবং নতুন ঘোষিত এইমএস-সহ সংখ্যাটা মোট ২২-এ পৌঁছেছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে ২২টি এইমএস ২০২৫ সালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে চালু হবে।

এছাড়া মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৭০ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৪ সালে ৩৮৭টি মেডিক্যাল কলেজ ছিল, যেখানে ২০২৩ সালে সংখ্যা বেড়ে ৬৬০-এ দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার দরিদ্র পরিবারের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কভারেজ নিশ্চিত করার জন্য একটি ফ্ল্যাগশিপ স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প 'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' চালু করেছে। আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন, যা আযুষ্মান ভারত স্থাস্থ্য অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ডিজিটাল আকারে স্বাস্থ্যের রেকর্ড করে, অভাবীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব করেছে।

সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উচ্চমানের জেনেরিক ওযুধ পেতে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি পরিকল্পনা (PMBJP) একটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রকল্পের অধীনে, ভারত সরকার ৯০০০টিরও বেশি প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি কেন্দ্র (PMBJKs) খোলা হয়েছে যেগুলি বাজার মূল্যের চেয়ে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সস্তায় জেনেরিক ওযুধ সরবরাহ করে।

এই দোকানগুলি সুলভ মূল্যে প্রায় ১৮০০টি ওযুধ এবং ২৮০টি অস্ত্রোপচারের যন্ত্র বিক্রি করে। একইভাবে AMRIT ফার্মেসিগুলিতে প্রায় ৫০০০ ওযুধ, স্টেন্ট, ইমপ্লান্ট এবং সার্জিক্যাল ডিসপোজেবল এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্য রয়েছে সাধারণ বাজারের তুলনায় ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কম দামে। ভুলে গেলে চলবে না জনঔষধি কেন্দ্রগুলি মাত্র ১ টাকায় স্যানিটারি ন্যাপকিন বিক্রি করে যা প্রান্তিক মহিলাদের কাছে সহজেই প্রাপ্য করে তোলে।

ভারতে জনগণকে সামগ্রিক স্বস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদানের জন্য ভারত সরকার আয়ুষ এবং এর অফ-শুট আয়ুর্বেদ আহারকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্ষমতায় আসার পর থেকে মহিলাদের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প শুরু হয়েছে। সুরক্ষিত মাতৃত্ব আশ্বাসন (সুমন) মিশন ইন্দ্রধনুষ (এমআই), পিএম পোষণ প্রকল্প এবং অন্যান্য কর্মসুচিগুলো গর্ভাবস্থায় এবং জন্মের পরে মহিলা এবং শিশুদের আরও ভালো যত্নপ্রদান করেছে। মায়েদের যত্ন নেওয়া ছিল বিজেপির সংকল্পপত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এ পর্যন্ত সরকার ৩৮ কোটির বেশি এবিএইচএ অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছে। ১৮ কোটিরও বেশি রোগী আযুষ যোজনার অধীনে যত্ন পেয়েছে। পিএম সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানের অধীনে ৩.৯ কোটিরও বেশি গর্ববতী মহিলা চিকিৎসা সেবা পেয়েছেন। ৯.৫৫ লক্ষেরও বেশি টিবি রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। মিশন ইন্দ্রধনুষের কারণে ৫.৬৫ কোটিরও বেশি মা ও শিশুকে সুক্ষিত করা হয়েছে। ই-সঞ্জীবনির মতো প্রোগ্রামগুলো ১১ কোটি টেলিকনসালটেশনের মাইলফলক চিহ্নিত করেছে।

নয় বছরে এলপিজি সংযোগ দ্বিগুণেরও বেশি

মোদী সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, তখন মাত্র ১৪.৫২ কোটি পরিবারের এলপিজি সংযোগ ছিল। সরকার তার নাগাল প্রসারিত করতে এবং মহিলাদের ক্ষতিকারক ধোঁয়া থেকে বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা শুরু করেছে। ২০২৩ সালের মার্চ নাগাদ এলপিজি সংযোগের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১.৩৬ কোটি অর্থাৎ মাত্র নয় বছরে সরকার এলপিজি সংযোগ দ্বিগুণেরও বেশি করেছে। ভারতে এলপিজি কভারেজ ২০১৬ সালে ৬২ শতাংশ থেকে (স্কিম চালু হওয়ার সময় থেকে) ২০২২ সালে ১০৪ শতাংশের বেশি হয়েছে।

শিক্ষা খাত

বিজেপি তার সংকল্পপত্র ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছে। বই এবং অনলাইন কোর্সের ডিজিটালাইজেশন মোদী সরকারের এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা খাতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। নতুন শিক্ষা নীতি ২০২০-এর লক্ষ্য ছিল প্রথম থেকেই বুনিয়াদি চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি করার প্রতি মনোনিবেশ করা। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রায় ৪০০টি এনসিইআরটি বই ডিজিটালাইজড করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে ডাউনলোড করার ব্যবস্থ রয়েছে শিক্ষার্থীদের সুলভ মূল্যে উচ্চশিক্ষার আরও

ভালো সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকার নতুন আইআইটি এবং আইআইএম খুলেছে। ২০১৪ সাল থেকে প্রায় ৩৫০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সারাদেশে ৪৩ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৬১.৪ শতাংশ কলেজ এখন গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত। ২০১৪ সালের ক্ষমতায় আসার পর থেকে মোদী সরকার ৭টি আইআইটি এবং ৭টি আইআইএম খুলেছে। ২০১৪ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী মোদী দায়িত্ব নেন তখন দেশে ৭২৩টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এবং সংখ্যাটা এখন ১১১৩টি দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু ২০১৪ সালে ভারতে ৩৮৪৯৮টা কলেজ ছিল যা ২০২৩ সালে বেড়ে ৪৩৭৯৬-এ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মাত্র নয় বছরে দেশে নতুন ৫২৯৮টি কলেজ তৈরি করা হয়েছে যা সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া সম্ভব হতো না।

রাস্তা পরিকাঠামো

যে কোনো দেশের অগ্রগতির জন্য সড়ক পরিকাঠামো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সরকার সড়ক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশকে ব্যাপকভাবে সংযুক্ত করার ওপর জোর দিয়েছে। ভারতে প্রায় ৬৩.৭৩ লক্ষ কিরোমিটার সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম। গত নয় বছরে, করিডোর-ভিত্তিক জাতীয় মহাড়ক উন্নয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে, রাস্তা নির্মাণ ২০১৪ সালে দিনে ১২ কিলোমিটার থেকে ২০২১-২২ সালে দিনে ২৯ কিলোমিটার উন্নীত হয়েছে। ভারত সরকার সীমান্ত পরিকাঠামো তৈরিতেও মনোনিবেশ করেছে। উল্লেযোগ্যভাবে শুধুমাত্র গত পাঁচ বছরে ভারতর সরকার সীমানা সংযোগকারী ১৩৫২৫ কিলোমিটারের বেশি রাস্তা তৈরি করেছে। গ্রামীণ এলাকাগুলিকে শহরের সঙ্গে সংযুক্ত রা যোগাযোগ উন্নত করে এবং দুই পক্ষের মধ্যে পণ্য পরিবহণে সহায়তা করে। গ্রামীণ সংযোগের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে ভারত সরকার প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে ২০১৪ সাল থেকে ৩.২৮ লক্ষ কিলোমিটারের বেশি গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করেছে। ২০১৯ সালের ইস্তেহারে, বিজেপি গ্রামীণ রাস্তা আপগ্রেডেশন প্রোগ্রামের অধীনে গ্রামীণ এলাকাগুলিকে শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করার কথা বলেছিল এবং প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করেছিল।

ডিজিটাল বিপ্লব

জনধন অ্যাকাউন্ট থেকে আধার সংযোগ পর্যন্ত রূপে কার্ড এবং ইউপিআই মাধ্যমে মোদী সরকারের উদ্যোগগুলো ডিজিটাল লেন-দেন বাড়াতে সাহায্য করেছে। সংকল্পপত্রে বিজেপি ডিজিটাল লেন-দেন প্রচার এবং বাড়ানোর কথা বলেছিল যা তারা করেছে। বিষয়গুলিকে প্রাসঙ্গিক রাখার জন্য আগস্ট ২০১৬-তে ইউপিএ-এর সঙ্গে ২১টি ব্যাংক যুক্ত ছিল এবং ডিজিটাল লেন-দেনের সংখ্যা ৩.০৯ কোটি টাকা মূল্যের ০.০৯ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ সালের এপ্রিলে ৪১৪টি ব্যাংক ইউপিআই-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

মোদী সরকার সরাসরি সুবিধা স্থানান্তর বা ডিবিটির উপর জোর দিয়েছিল যার ফলে আর্থিক সুবিধাগুলো সরাসরি সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল। নয় বছরে সরকার বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের অধীনে ২৯ লক্ষ কোটিরও বেশি হস্তান্তর করেছে মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ দিয়ে এবং ফাঁকফোকর বন্ধ করেছে। ডিবিটির মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর করে সরকার ২.২৩ লক্ষ কোটিরও বেশি টাকা সাশ্রয় করেছে।

সৌভাগ্য ও প্রতি ঘরে জল

মোদী সরকারের অধীনে দুটো গুরুত্বপূর্ণ মিশন, নাম 'সৌভাগ্য' এবং 'হর ঘর জল' কোটি কোটি ভারতীয়কে উপকৃত করেছে। জল জীবন মিশন থেকে ৮ কোটিরও বেশি পরিবার উপকৃত হয়েছে এবং কলের জলের সংযোগ পেয়েছে। সৌভাগ্য যোজনার অধীনে তিন কোটিরও বেশি পরিবারকে বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে যাতে ৯৯.৯ শতাংশ বিদ্যুতের কভারেজ নিশ্চিত করা হয়েছে। দুটি পরিকল্পনাই ছিল বিজেপির ঘোষণাপত্রের অংশ।

নয় বছরে মোদী সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যোজনা

বিজেপির লক্ষ্য দেশের কৃষকদের জীবন উন্নত করা। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার মতো কল্যাণমূলক প্রকল্পের অধীনে ভারত সরকার ৮০ কোটিও বেশি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করেছে। রাজ্যগুলিতে মোট ৪.০৪ লক্ষ কোটি টাকার খাদ্য ভরতুকি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এফসিআইকে ১৪.৪৮ কোটি টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোভিডের সময় শুরু হওয়া এনএফএসএ-এর অধীনে বিনামূল্যের খাদ্যশস্য প্রকল্প খদ্যশস্য প্রকল্প ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহুরে)-র ফলে শহুরে বাড়ির সংখ্যা ৮০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রেকর্ড অনুসারে ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের অধীনে ৮.০৪ লক্ষেরও বেশি বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত ৯ বছরে ৭৪ লক্ষের বেশি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে।

স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার অধীনে এসসি এসটি সম্প্রদায়ের জন্য ৭৫৫৮ কোটি টাকার বেশি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি প্রকল্পের অধীনে ৪২.৮৭ লক্ষ অ্যাকাউন্টে ৫১৮২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

৪৮.৯ কোটির বেশি জনধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ৮ কোটিরও বেশি বাড়ি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২৮.৯০ কোটিরও বেশি অসংগঠিত শ্রমিক এখন ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধিত।

১১ কোটির বেশি টয়লেট তৈরি করা হয়েছে।

৩৩.৪৮ কোটিরও বেশি লোক প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার অধীনে নথিভুক্ত হয়েছে। মুদ্রা ঋণের অধীনে ২৭.৭ কোটিরও বেশি জামানত-মুক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

স্বল্পমেয়াদি জামানত-মুক্ত ঋণ, বয়স্ক কৃষকদের জন্য পেনশন স্কিম, ভরতুকিযুক্ত বীজ এবং সার-সহ কৃষকদের জন্য

কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি এই সরকার মাটিতে এনেছে এমন কিছু সুবিধা। উপরন্তু মৃত্তিকা কার্ড, ফসল বিমা যোজনা এবং কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সারা দেশে কোটি কোটি কৃষককে সাহায্য করেছে।

ফ্ল্যাগশিপ সরকারি স্কিম সম্পর্কে রিয়েল টাইম আপডেট ২/১২/২০২২ পর্যন্ত

এটা শুধুমাত্র একটা প্রতিনিধিত্বমূলক বিভাগ এবং সরকারি স্কিম এবং প্রোগ্রামগুলির সম্পূর্ণ তালিকা নয়।

পেনশনভোগী পেনশনভোগী জীবন প্রমাণ দ্বারা উপকৃত—৬, ৭৮,৪৪,০০০।

DDU-GKY-এর অধীনে প্রশিক্ষিত লোকের মোট সংখ্যা— ১২,৬৯,৪৪২।

অটল পেনশন যোজনার অধীনে মোট গ্রাহক সংখ্যা—৪,৬৭, ০০,০০০।

কমন সার্ভিস সেন্টারের মোট সংখ্যা (CSC)— ৫,৪৯,০০০।

পিএম উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে এলপিজি সংযোগগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। —৯,৫৬,৫৭,৯৯৯।

ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্ট ব্যাংকের অধীনে ডোর স্টেপ ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদানকারীর সংখ্যা— ১,৩৫,০২৫।

পিএম জন আরোগ্য যোজনার অধীনে মোট সংখ্যক বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়েছে—৩,৬২,৪৫,১০০।

MyCOv গ্রাহকরা— ৩,০৯,৬৪,৯৫৯।

স্টার্ট আপের মোট সংখ্যা স্বীকৃত— ৮৪,২৬০।

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় সুবিধাভোগী—৪৭,৭৮, ০০,০০০।

মিশন ইন্দ্রধনুষের অধীনে শিশুদের টিকা দেওয়া হয়েছে—৪, ১০,০০,০০০।

যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল সংযুক্ত এবং সরঞ্জাম ইনস্টল রপা হয়েছে—১,৮৮,২৪৩।

২০১৮ সাল থেকে পিএম ফসল বিমা যোজনার অধীনে নিবন্ধিত কৃষকের সংখ্যা—১১,৪২,০৭,৯৬০।

বিদ্যুৎবিহীন গ্রামের সংখ্যা—০।

উন্মুক্ত মলত্যাগ মুক্ত (ওডিএফ) প্লাস গ্রাম— ১,৩৪,৩৯৬।

২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষ থেকে পিএম গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে অনুমোদিত রাস্তার দৈর্ঘ্য— ৩,৩৮,২১৭ কি.মি.।

সরকারি-ই-মার্কেটপ্লেসে (GeM) মোট লেন-দেনের মূল্যরূপি— ৩৩,৭৯,৮৯,০০,০০,০০০।

SWAYAM-এ নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা— ৩,০৪, ৫৫,৫১৭।

PM-KISAN সম্মান নিধি যোজনার আওতায় সুবিধাভোগী কৃষকের সংখ্যা— ১১,৩৭,০০,০০০।

জুলাই ২০১৬ থেকে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ইউপিআই লেন-দেনের মূল্য (কোটিতে)— ২,৪৩,৪০,০৫,৬৮১।

অটল টিঙ্কারিং ব্যাবসের আওতায় স্কুলের সংখ্যা— ১০,০০০।

DigiLocker-এর মাধ্যমে ইস্যুকৃত নথির সংখ্যা— ৫,৬২,০০, ০০,০০০।

২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে সরাসরি সুবিধা স্থানান্তররূপি— ২,৬০,২২,৬৭,২০,০০,০০০।

পিএম জীবন জ্যোতি বিমা যোজনার অধীনে নথিভুক্ত নাগিরকরা— ১৪,০১,৯৯,৯৯৯।

পিএম শ্রমযোগী মান-ধন যোজনার অধীনে নথিভুক্ত মোট লোকের সংখ্যা— ৪৯,১২,০৮৭।

পিএম সুরক্ষা বিমা যোজনার অধীনে নথিভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা—৩০,৫৭,০০,০০০।

স্বচ্ছ ভারত-এর অধীনে তৈরি করা হয়েছে গৃহস্থালীর টয়লেট— ১১,৬৮,২০,০০০।

উজ্বলা প্রকল্পের অধীনে এলইডি বিতরণ করা হয়েছে—৩৬, ৮৬,৮৫,৩৩১।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সংগ্রহ করা জিএসটি-এর পরিমাণ— ১১,১৯,৯৮,৫৯,০০,০০০ কোটি টাকা।

পিএম ভারতীয় জন ঔষধি পরিকল্পনা কেন্দ্রের মোট সংখ্যা— ৮, ৯১৮।

অক্টোবর ২০১৭ থেকে সৌভাগ্যের অধীনে বিদ্যুতায়িত পরিবারের সংখ্যা— ২,৮১,৬৯,৭২৪।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে বারিগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে— ২,৭১,৪৮,২৮২।

মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড পাঠানো হয়েছে— ২২,৯১,৩০,৫৪৮।

জাতীয় বৃত্তি পোর্টালে মোট যাচাইকৃত আবেদন— ৮,৩৯,৫০, ০০০।

eNAM-এ নিবন্ধিত কৃষকের সংখ্যা— ১,৭৪,০৭,২৪২।

মুদ্রা যোজনার অধীনে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে—৩৭,৭৬,০৫, ৩০৫।

৮৫টি বিদেশে রপ্তানিকৃত প্রতিরক্ষা সবঞ্জামের পরিমাণ ১৬০০০ কোটি টাকা। সর্বকালীন রেকর্ড, ২৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সামরিক উৎপাদন। দেশের ১০০টি সংস্থা প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন করছে।

সবুজ শক্তি হলো জীবাশ্ম জ্বালানিকে পুনর্নবীকরণযোগ্য করার জন্য বিকল্প প্রযুক্তির বিকাশ যা সামান্য বা কোনো দূষণ নির্গত করে না। সবুজ শক্তি বিনিয়োগ হিসেবে ভালো। পরিবেশ বাঁচানোর লক্ষ্যে গ্রিন এনার্জি তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ব ধীরে ধীরে স্থায়ী সমাধানের দিকে এগোচ্ছে। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার মতে ২০২৬ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী নবায়নযোগ্য শক্তি ৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এই তথ্যগুলি ইঙ্গিত দেয় যে সবুজ শক্তি হলো ভবিষ্যৎ, যাতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬৩৪.২৮৭ বিলিয়ন ইউএসডলার ছিল। সর্বোচ্চ ছিল ৬৫৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার। সর্বশেষ দাঁড়িয়েছে ৫৯৬ বিলিয়ন ইউএসডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত বিশ্বে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। □

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি অনেক মজবুত হয়েছে

আনন্দ মোহন দাস

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের নয় বছরের শাসনকালে দেশের বুনিয়াদি অর্থনীতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে তা পরিসংখ্যানে স্পষ্ট হয়েছে।

(১) ব্যাংক ব্যবস্থা ঃ যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণে সরকারি ব্যাংকগুলির অবদান অনস্বীকার্য। তাই ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইউপিএ তথা কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে ঋণ প্রদানের পরম্পরা ও সংস্কৃতির প্রকোপে ব্যাংকগুলির নাভিশ্বাস উঠেছিল। প্রতিটি ব্যাংকে ডিরেক্টর হিসাবে রাজনৈতিক দলের আস্থাভাজন লোকেরা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে তাদের কর্তাদের বেআইনি নির্দেশ পালনে ব্যস্ত থেকেছেন। তার ফলে ২০০৭ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত নীরব মোদী, মেহুল চোকসি ও তদানীন্তন কিংফিশার বিজয় মাল্য প্রভৃতিদের রমরমা বেড়েছিল এবং আর্থিক যোগ্যতার পরিবর্তে চাঁদা, উৎকোচের মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ যথাযথ স্ক্রুটিনি ছাড়াই প্রদান করা হয়েছে। যার ফলে পরবর্তীগকালে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। নীরব মোদী, মেহুল চোকসি ও বিজয় মাল্যর ঋণ অনুমোদিত হয়েছিল কংগ্রেস তথা ইউপিএ সরকারের শাসনকালে, অথচ এরাই সবচেয়ে বেশি চিৎকার করে মোদী সরকারের বদনাম করেছে। বাংলায় প্রবাদ আছে — 'চোরের মায়ের বড়ো গলা।' উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, বিজয় মাল্যকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে এবং নীরব মোদীকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল ২০১১ সালের মার্চ মাসে। সুতরাং কংগ্রেস তার দায় এড়াতে পারে না। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বর্তমানে মোদী সরকারের আমলে ব্যাংকগুলির আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী ও ভালো। এই প্রথম এসবিআই ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে রেকর্ড পরিমাণ ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি লাভ করেছে এবং ১১.৩০ পয়সা শেয়ার পিছু লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। বেশিরভাগ সরকারি ব্যাংক লাভের মুখ দেখতে আরম্ভ করেছে যা এক সময় অকল্পনীয় ছিল। ফলে ব্যাংকগুলিকে বাঁচাতে প্রত্যেক ত্রৈমাসিকে সরকারকে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংকগুলিকে মূলধনী খাতে খরচ করতে হতো যা আজকের দিনে অনেকটা কমেছে। সেই টাকা সরকার উন্নয়নের কাজে খরচ করতে সমর্থ হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে সমস্ত সরকারি ব্যাংকেগুর সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৮৫৩৯০ কোটি টাকা। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ক্ষতির পরিবর্তে সরকারি ব্যাংকগুলি সর্বমোট ১০৪৬৪৯ কোটি টাকা লাভ করেছে যা এককথায় প্রশংসনীয়। ১২টি পাবলিক সেক্টরে ব্যাংক গত বছরে ৫৭ শতাংশের বেশি মুনাফা বৃদ্ধি করেছে। এর পেছনে মূল কারণ হলো নরেন্দ্র মোদী সরকারের ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিচালন ব্যবস্থায় পারদর্শিতা আনা। উদাহরণস্বরূপ, 'ইনসলভেন্সি ব্যাংকরাপসি কোডের' প্রবর্তন, এনসিএলটি প্রভৃতি। তাছাড়া অনুৎপাদক ঋণের পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, চিহ্নিত করে দ্রুত অনাদায়ী ঋণের পুনরুদ্ধার এবং ঋণ প্রদানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। যার ফলে তুলনামূলকভাবে অনুৎপাদক ঋণের পরিমাণ শতাংশের হারে অনেকটাই কমেছে এবং ব্যাংকগুলির মুনাফা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী এনসিএলটি-র মাধ্যমে প্রায় ৩৬ শতাংশ ঋণ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে সফল ব্যাংকিং সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে। সরকারি ব্যাংকগুলির সামনে বেসরকারি ব্যাংকগুলিও ঋণ পুনরুদ্ধার ও মুনাফা অর্জনে আরও বেশি দক্ষতা দেখিয়েছে।

২০১৮ সালে অনুৎপাদক ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪.৭ শতাংশ। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে তা কমে হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। অ্যাসোচেম ও রেটিং এজেন্সি CRISIL জানিয়েছে, আগামী অর্থবছরে (২০২৩-২৪) ব্যাংকের মোট অনুৎপাদক ঋণের পরিমাণ কমে ৪ শতাংশের নীচে থাকবে। অর্থাৎ ব্যাংকগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য আরও মজবুত হবে।

(২) শেয়ার বাজার ঃ উন্নত মানের অর্থব্যবস্থায় শেয়ার বাজারের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের একটি বড়ো মাধ্যম হলো শেয়ার বাজার। বর্তমান সরকারের আমলে শেয়ার বাজার অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত থাকায় বিদেশি বিনিয়োগকারী ছাড়াও সাধারণ মানুষও শেয়ার বাজারে বিনিযোগে উৎসাহিত হচ্ছেন। বর্তমানে শেয়ার বাজারের সূচক সর্বোচ্চ ৬৩ হাজারের উপর পৌঁছে গেছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা গত মে মাতে ৩৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন যা বিগত ছয় মাসে সর্বোচ্চ। সুতরাং ভারতের আর্থিক অবস্থায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যে উৎসাহিত বোধ করেছেন এটা তার প্রমাণ।

(৩) বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার ঃ যে কোনো দেশের আর্থিক অবস্থা কতটা মজবুত তার অন্যতম মাপকাঠি হলো সেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত ভাণ্ডারের পরিমাণ। ভারতে ইতিমধ্যে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার রেকর্ড পরিমাণ ৬০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে যা এককথায় অভূতপূর্ব। এটি ভারতের শক্তিশালী অর্থব্যবস্থার পারিচায়ক। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও শ্রীলঙ্কার অবস্থা আমরা লক্ষ্য করেছি।

(৪) জীবন বিমা (LIC) ঃ সরকারি সংস্থা জীবন বিমা কর্পোরেশন ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে শেষ ত্রৈমাসিকে মুনাফা প্রায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৪২৭ কোটি টাকা হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় ৪৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই বছরের মোট নিট মুনাফা দাঁড়িয়েছে ৩৬৩৯৭ কোটি টাকা যা তুলনামূলকভাবে গত বছর মাত্র ৪০৪৩ কোটি টাকা ছিল। যারা জীবন বিমা সংস্থা উঠে যাবে বলে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অহেতুক চিৎকার জুড়ে থাকেন, এই ফলাফল তাদের মুখের ওপর যোগ্য জবাব দিয়েছে। কিছুদিন আগে লক্ষ্য করা গেছে, আদানি গ্রুপের শেয়ারে জীবন বিমার বিনিয়োগ হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশের পর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিরোধীরা তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং মোদীর বিরুদ্ধে LIC উঠিয়ে দেবার অভিযোগ তুলে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। তাদের জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই বিনিয়োগ থেকে এলআইসি বর্তমানে প্রায় ৫৫০০ কোটি টাকা লাভে চলেছে।

(৫) আরবিআই-এর লভ্যাংশ প্রদান ঃ ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে বিজার্ভ ব্যাংক কেন্দ্রীয় সরকারকে ৮৭৪১৬ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদানের কথা ঘোষণা করেছে যা গত বছরের তুলনায় তিনগুণ বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে আনুমানিক লভ্যাংশের পরিমাণ ৪৮০০০ হাজার কোটি টাকা হিসাব করেছিল। সুতরাং এই অতিরিক্ত পরিমাণ টাকা সরকারের আর্থিক অবস্থা মজবুত করবে এবং উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করতে সুযোগ পাবে। বিপুল পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান প্রমাণ করে অর্থ ব্যবস্থার গতিশীলতা।

(৬) মুদ্রাস্ফীতি ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতি আজ চল্লিশ বছরের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে। তাদের মুদ্রাস্ফীতি ১০ শতাংশের ওপর চলে গেছে এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। ভারতের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের মুদ্রাস্ফীতি বর্তমানে ৩৬ শতাংশ। সেই অবস্থায় একমাত্র দেশ ভারত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উল্লেখনীয় যে, সেক্ষেত্রে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। বর্তমানে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ৪.৭ শতাংশ, যার ফলে জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। খাদ্যশস্যের জোগানে কোনো খামতি নেই। যেখানে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির সরবরাহ শৃঙ্খল নষ্ট হয়ে খাদ্যের জোগানে সংকট দেখা দিয়েছে, ভারতের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সঠিক আর্থিক নীতির প্রতিফলন বলেই অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন।

(৭) বাজেট ঘাটতি ঃ দু'বছর করোনা মহামারীর প্রকোপে কঠিন আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে উদ্ধার কার্য, চিকিৎসা ও জনকল্যাণ কাজে সরকারের বিপুল অর্থব্যয় সত্ত্বেও গত আর্থিক বছরে বাজেট ঘাটতি ৬.৪ শতাংশ যা বাজেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এটি আর্থিক শৃঙ্খলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৮) জিএসটি আদায় ঃ তেজি বা গতিশীল অর্থব্যবস্থার আর একটি প্রমাণ হলো সরকারের বিভিন্ন ধরনের কর আদায়ের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ, গত তিন মাসে ক্রমাগত ১৫ হাজার কোটি টাকার উপরে জিএসটি সংগ্রহ করেছে সরকার। ব্যবসা ও উদ্যোগ বৃদ্ধি না পেলে কর আদায় বৃদ্ধি সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে রাজস্ব আদায় বেশি হলে সরকার উন্নয়নমুখী কাজের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়।

সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সি মুডিস জানিয়েছে, আগামী কয়েক বছরে ভারত জি-২০ অর্থব্যবস্থায় বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগতির অর্থনৈতিক আবস্থায় পৌঁছে যাবে। এমনকী মরগ্যান স্ট্যানলি সম্প্রতি তাদের আর্থিক রিপোর্টে উল্লেখ করেছে এক দশক আগের ভারত অর্থাৎ ২০১৩ সালের ভারত আর ২০২৩ সালের ভারতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এক দশকে ভারত অর্থনীতি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করেছে যা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। বিশ্ব আর্থিক বাজারে ভারত আজ এক উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিশ্বে ভারতের মর্যাদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি, বহু কোম্পানি ও কয়েকটি ব্যাংকের দেউলিয়া ঘোষণা করার ফলে সে দেশের আর্থির অবস্থা সঙ্গিন। বিশ্ব অর্থনীতির ডামাডোল পরিস্থিতিতে একমাত্র ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে এক উজ্জ্বল বিন্দু হিসেবে বিশ্ব আর্থিক সংস্থার প্রতিনিধিরা মন্তব্য করেছেন। সেজন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানরা নরেন্দ্র মোদীকে উদ্ধারকর্তা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সরকার-বিরোধী অর্থনীতিবিদ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির অনুমানকে ভুল প্রমাণ করে ভারতের ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে জিডিপির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.২ শতাংশ। এতেই প্রমাণ করে যে সারা বিশ্বে ভারত এক দ্রুতগামী গতিশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নীতীশ কুমারের হাবভাব

হাবভাবটা এমন যেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েই গেছেন। শুধু শপথ নেওয়াই বাকি আছে। লজ্জা না থাকলে যা হয়। তিনি যে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তা তো অন্য দলের দয়ায়। আগে ছিলেন বিজেপির দয়ায়। বর্তমানে চারা ঘোটালায় আসামি লালুপ্রসাদের দলের দয়ায়। জোটে ছোটো দল হয়েও ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং করেই তাঁর এই পদ লাভ। যখন বিজেপির জোটে ছিলেন তখন তাকে মুখ্যমন্ত্রী না করলেই তার রাবড়ি-বৌদি ডাকছেন তা তার শাগরেদদের দিয়ে বলিয়ে দিতেন। লালুর দলে গিয়েও ওখানে বিজেপির ডাকের কথা মুখে আনতেন। সবাই জানে উনি পালটিবাজ। চাকরি চোর, গোরু-কয়লা-পাথর পাচারকারী দল তো বিজেপির উচ্ছিষ্টকে নিয়ে নাচানাচি করবে তাতে আর নতুনত্ব নেই। হাতে গোনা জামিনে থাকা অর্থনৈতিক অপরাধী নেতা নিয়ে মিথ্যার জাল বুনে দিল্লি জয়? এত সোজা নাকি। গুটিকয় মুখ্যমন্ত্রী নিয়েই নিজেরাই বলে দিচ্ছে 'বিজেপি মুক্ত ভারত'। দেশের মানুষ কি বোকা নাকি? সব দেখছে। কী হলো কংগ্রেস কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে জিতে। ওখানে মুখ্যমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে স্লোগান উঠল, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' লোকসভা নির্বাচনের জন্য ওখানকার মানুষ মুষ্টিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে বদলা নেওয়ার। সময় বলবে শেষ কথা। মানুষ বলবে শেষ কথা। দেশবাসী উন্নয়ন চায়। ওরা চায় চুরি করতে। অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আজ বিশ্বের এক নম্বর নেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী। গর্বিত দেশবাসী। বিজেপি কর্মকর্তারা বাড়ি বাড়ি যাবেন। বিজেপির মন্ত্র এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

তামিলভাষী চোল রাজবংশ নামের তাৎপর্য

চোলরা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের আদি অধিবাসী তামিলভাষী গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর রাজবংশ ছিল অতি প্রাচীন। মহাভারতে চোলদের উল্লেখ দেখা যায়। বৈয়াকরণ কাত্যায়ন চোলদের কথা জানতেন। ২৩০০ বছর আগে অশোকের শিলালিপিতে চোল জাতির উল্লেখ আছে। গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকরাও চোলদের নাম উল্লেখ করেছেন। পেরিপ্লাসের রচনায় চোল বন্দরের নাম পাওয়া যায়। টলেমি চোল বন্দর কাবেরীপত্তনম ও নেগাপত্তনমের উল্লেখ করেছেন। চোল রাজা আদিতে খুব শক্তিশালী হলেও চালুক্য, পল্লব ও রাষ্ট্রকূটদের আগ্রাসনের ফলে তাঁরা দীর্ঘকাল হীনবল হয়ে পড়েন। আবার নবম খ্রিস্টাব্দের (৮৫০) মাঝামাঝি চোল শক্তির পুনরায় অভ্যুত্থান ঘটে। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর দক্ষিণ ভারতে তাঁরা যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। এরূপ অতি প্রাচীন জাতির বা রাজবংশের নাম 'চোল' কীভাবে হলো তা জানার আগ্রহ আমাদের থাকতেই পারে।

ইতিহাস অনুসারে চোল রাজাদের বিশাল নৌবহর ছিল। ভারত ইতিহাসে আর কোনো রাজশক্তির এত বড়ো নৌবহর ছিল না। চোল রাজারা প্রথম থেকেই সমুদ্র সংলগ্ন ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব বিস্তার ঘটাতে যত্নবান হয়েছিলেন এবং সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, সিংহল, মালয়, সুমাত্রা, জাভা ও ইন্দোচীন এলাকায় চোল রাজারা তাঁদের প্রভাব বিস্তার করেন। তিন সামুদ্রিক প্রতিবেশী পাণ্ড্য, কেরল, সিংহলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নৌবাহিনীর শক্তিতে। চোল রাজারা বঙ্গোপসাগরকে 'চোলদের হ্রদ'-এ পরিণত করেছিলেন। এভাবে আরও অনেক কিছু লেখা রয়েছে ইতিহাসে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, চোল সাম্রাজ্যে নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। উল্লেখ্য, সংস্কৃত অভিধান অনুসারে 'চোলক' শব্দের অন্যতম অর্থ তিন মাস্তুলওয়ালা পালতোলা জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি। এই অবস্থায় আমরা বলতে পারি, নৌ পরিচালনায় যারা বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন তাঁরা চোলকঃ শব্দের অনুকরণে চোল জাতি নামে পরিচিত হন। এই দক্ষতাই তাঁদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছিল দক্ষিণ থেকে পূর্ব পর্যন্ত। পরিশেষে বলতে হয়, চোল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল নৌবাহিনীর শক্তি।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ।

ভারত সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হবে

বর্তমান ভারতবর্ষে আমরা যে পরিমণ্ডলে এগিয়ে চলেছি তাতে একটি বিশেষ সম্প্রদায় একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ভারতবর্ষে বিদেশি সংস্কৃতি সবার উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। সেই সংস্কৃতি অনুসারে যেখানে মানুষের মুক্তচিন্তার অবকাশ নেই, স্বাধীনভাবে পোশাক পরার অবকাশ নেই। ভাষার ব্যবহার, খাওয়াদাওয়া সম্পূর্ণ বিজাতীয়। সেই জনগোষ্ঠী সদা সক্রিয় তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য। অনেকাংশেই তারা সফল। দাবানল যেমন গ্রাস করে বনকে, সেই রকম ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে এগিয়ে চলেছে। ঠিক এই মুহূর্তে বাকি অধিকাংশ মানুষের মধ্যে অল্প কিছু অংশ বিজাতীয় সংস্কৃতি প্রতিরোধ করে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণে সদা সচেষ্ট ও ক্রিয়াশীল দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় সংস্কৃতি যারা ভালোবাসে ঠিক এই সময়ে তাদের জাগরণ প্রয়োজন। অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যেমন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীজী জোরের সঙ্গে বলছেন ভারত হিন্দুরাষ্ট্র ছিল, আছে ও থাকবে। ঠিক এই সময়েই সকল ভারতবাসীকে জোরের সঙ্গে সরকারকে বলতে হবে, ঘোষণা করতে হবে ভারত হিন্দুরাষ্ট্র ছিল, হিন্দুরাষ্ট্র আছে, হিন্দুরাষ্ট্র থাকবে। তবে নিশ্চিত, ভারত একদিন ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হবে। তবেই ভারত ও ভারতের মহান সংস্কৃতি রক্ষা পাবে।

—সঞ্জয় বাড়ুই,
বাঁকুড়া।

বর্তমান সমাজের অবক্ষয়

মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে একদিন সমাজ গড়ে তুলেছিল। মানুষ তার শ্রম ও বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে একটু একটু করে আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলছে। সমাজকে চালনা করতে গিয়ে কালের নিয়মে নানা নিয়ম ও রীতিনীতি চালু করেছে। জাতপাত, ধনী-দরিদ্র, ভেদাভেদ আগেও ছিল, এখনও আছে, কিন্তু অর্থ ও ক্ষমতার প্রাচুর্যে সেগুলো লঘু হয়ে যায়। আগে মানুষ সমাজের নিয়ম ও রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চলতো। একটা সামাজিক সম্মানহানির ভয় ছিল। তাই তখন বাড়ির মেয়ে, বউরা অনেক খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতো। সমাজের মধ্যে অনুশাসন ছিল। খুন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি করে ধরা পড়লে সামাজিক ভাবে সালিশি সভা বসিয়ে তার কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। আর এখন এইসব কাজ উত্তরোত্তর বেড়েছে কিন্তু পুলিশ, নেতা, মন্ত্রীর ছত্রছায়ায় তার তেমন কোনো শাস্তি হয় না।

ফলে অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়েছে। মানুষের অভাব ছিল, বিলাসিতা তেমন ছিল না। আধুনিকতার চাপ ছিল না কিন্তু মানবিকতা, ভালোবাসা, আন্তরিকতা আর শান্তি, সরলতা ছিল। একে অপরের বিপদে-আপদে ছুটে যেত। লোভ ও চাহিদা কম ছিল। কিন্তু মানুষ যত আধুনিক হয়েছে ভোগ, বিলাসিতায় মত্ত হয়ে চাহিদা বেড়েছে। ফলে মানুষ চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি করে অর্থ উপার্জন করার যন্ত্র তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে এখন না আছে 'মান' আর না আছে 'হুঁশ'। কষ্ট করে খেটে, না খেয়ে, কঠোর পরিশ্রম করে ছেলে-মেয়েকে বড়ো করে তুলেছে আর তারা চরম স্বার্থপরের মতো আলাদা হয়ে যাচ্ছে। গর্ভধারিণী মাকে, বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাচ্ছে। নতুবা রাস্তায় ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতে বাধ্য করেছে। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিল পবিত্র। স্বামীকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা, ভক্তি করতো তখনকার সমাজে। এখন চরম সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে স্বামী, সন্তান ছেড়ে স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধছে নতুবা স্বামীকে নৃশংস ভাবে খুন করে ফেলছে।

স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র, জন্মজন্মান্তরের বন্ধন তাদের কাছে তুচ্ছ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার মধ্যে আগে একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। প্রতিবেশীর কথা তো বলার মতো নয়, সবকিছুতেই তারা একে অপরকে সন্দেহ, হিংসার দৃষ্টিতে দেখে তাই প্রতিবেশীর বিপদে প্রতিবেশী মনে মনে খুশি হয় আর ভালো কিছু দেখলে হিংসা করে। আগে গ্রামে বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ যে কোনো অনুষ্ঠানে পাড়া, প্রতিবেশীরা রান্নাবান্না, সবকিছুর ব্যবস্থা করতো।

বাবা-মা সন্তানকে টাকা রোজগারের মেশিন বানানোর চেষ্টা করে। ফলে আজকের ছাত্র সুনাগরিক আর হচ্ছে না। কারণ তারা তাদের বাবা-মা, আত্মীয় স্বজনদের ঠিক মতো দেখাশোনা করে না আর সমাজের কীভাবে উপকার করবে? সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত নজির হলো মোবাইলে সারাদিন মত্ত থেকে নোংরা ছবি আপলোড করে টাকা রোজগার করা। বর্তমানে কোনো খাদ্য দ্রব্য, ওষুধের উপর সরকারের তেমনভাবে নিয়ন্ত্রণ নেই। পচা, ভেজাল খাদ্য প্রতিনিয়ত আমরা খেয়ে চলেছি। তাই ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি আজ ঘরে ঘরে। লোভ, লালসা, অর্থ পিপাসা এতোটাই বেড়েছে যে আমাদের পরম বন্ধু ও জীবনদায়ী অক্সিজেন দানকারী গাছ নির্বিচারে কেটে ফেলছি। বর্তমানে সমাজের অবক্ষয় আটকাতে হলে আমাদের আবার সেই সরল জীবন যাপন করতে হবে। মুঠোফোনের নেশায় মত্ত না হয়ে শিশুকে ন্যায়, নীতি, অনুভূতি আর সামাজিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। আজকের শিশুকে আগামীদিনের টাকা রোজগারের মেশিন না বানিয়ে সমাজের উপযুক্ত সুনাগরিক তৈরি করতে হবে, তবেই হয়তো সমাজটা ভবিষ্যতে ধ্বসের হাত থেকে বাঁচবে।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোণারোড, পশ্চিমমেদিনীপুর।

জি-২০ সম্মেলন ও ভারতীয় দর্শন

মানব সভ্যতায় ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি জি-২০ সম্মেলন। স্থান জাপানের হিরোশিমায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কির মুখোমুখি হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মোদী-জেলেনস্কির প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কূটনৈতিক মহলে জল্পনা চলছিল। এদিন তা নতুন মাত্রা পেয়েছে জি-২০ সভাপতি হিসেবে ইউক্রেনের শীর্ষ নেতাকে মোদীর আশ্বাস, 'আপনার নাগরিকদের যন্ত্রণা খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারছি, আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে ভারত ও আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সংকট মেটাতে যতটা সম্ভব অবশ্যই চেষ্টা করব।' প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করে সবকিছু দেখে বেদনাসিক্ত হৃদয়ে বলেছিলেন, এটা সভ্যতার সংকট। সেই সভ্যতার সংকটের বিশেষ একটি ক্ষত চিহ্ন জাপানের হিরোশিমা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই হিরোশিমায় মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি উন্মোচন করলেন এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারত স্বাধীন হয়েছে হিংসার প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে হিন্দু রক্ত ঝরিয়ে গান্ধীজীর দর্শন ব্যর্থ করে দিয়ে। আর এই হিরোশিমা হিংসার আর একটি ক্ষত চিহ্ন। হিংসা নয় অহিংসাই করতে পারে মানব কল্যাণ সাধন। অহিংসা মানব সভ্যতার সত্য দর্শন— বিশ্বে এটা প্রমাণিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর সরকারি ভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হয়। ভারতীয় দর্শনের একটি কথা 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। তাই মোদীজীর 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' প্রণিধানযোগ্য, হিন্দু ধর্মসম্মত। বিশ্ব মাঝে অহিংসাই সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে, হিংসা নয়, এটাই প্রত্যাশা।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
রাশিডাঙ্গা-২, কোচবিহার।

পারম্পরিক খাবার বনাম বিজ্ঞাপন

সুতপা বসাক ভড়

কোনো দেশের পরম্পরা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সেই দেশের খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। আবার ভৌগোলিক, সামাজিক ও শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকেও খাদ্য আমাদের জীবনশৈলীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে নদ-নদী, জলাশয় বেশি থাকার কারণে আমরা মাছ এবং বিশেষ কিছু শাকসবজি (কলমি, কুলেখাড়া, পানিফল ইত্যাদি) পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের খাবারের তালিকাভুক্ত করেছি। আবার রাজস্থানের মতো রাজ্য যেখানে নদী-নালা অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে মূলত ডাল জাতীয় খাবার তালিকাভুক্ত করা হয়ে থাকে। পারম্পরিক খাদ্যগুলি যেমন সহজলভ্য, তেমনি পুষ্টিগুণেও সমৃদ্ধ।

কয়েকদশক ধরে বিশ্বায়নের প্রভাবে অনেক বিদেশি কোম্পানি আমাদের দেশকে পণ্যরূপে ব্যবহার করে চলেছে। নানান বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের পারম্পরিক খাদ্যগুলির গুরুত্ব কম করে দেখিয়ে, তাদের কোম্পানির জিনিস বিক্রি করে লাভ করে চলেছে। ফলস্বরূপ, আমরা নিজেদের আধুনিক প্রতিপন্ন করতে গিয়ে আমাদের পারম্পরিক খাদ্যাভ্যাসকে অবহেলা করে, অন্য দেশের খাবারগুলি আত্মসাৎ করছি। এর ফলে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সঙ্গে ছড়িয়ে আছে চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত আর একটি লাভজনক ব্যবসা।

এখন দিনের শুরু থেকে যদি আমাদের খাদ্যতালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাব— প্রথমে আসছে চা। ঠিক আছে, তবে বিজ্ঞাপন দাতারা বলছে— চা-ব্যাগ, ডেয়ারি হোয়াইটনার, সুগার কিউব ইত্যাদি দিয়ে চা বানাতে। অর্থাৎ বিশেষ কিছু কোম্পানির উপার্জন। অথচ আমরা নামকরা চা-দোকানের চা-পাতা কিনে জলে চা তৈরি করে খেতে পারি। এতে স্বাস্থ্য ও অর্থ দুইই ভালো থাকে। চায়ের সঙ্গে শুকনো মুড়ি খুবই উপাদেয়, কিন্তু বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে আমরা কোম্পানির বিস্কুট চিবিয়ে চলেছি।

প্রাতরাশে ওরা বলে প্যাকেটের ওটস্, কর্নফ্লেক্স এগুলি হলো স্বাস্থ্যকর খাবার। আমরা রুটি-তরকারি, দুধ, রুটি, দুধ-মুড়ি, দই-চিঁড়ে, ছাতু, উখো, চিড়ের পোহা, লুচি, পরোটা ছেড়ে ওইগুলি খাচ্ছি। কেন— শুধুই কি ঝামেলা কমাতে, নাকি স্ট্যাটাস দেখাতে? দুপুরের খাবারে নানান প্রয়োগ হলেও আমাদের খাবারগুলির গুরুত্ব এখনও পর্যন্ত বজায় আছে। কিন্তু বিকেলের জলখাবারে ব্যাপকভাবে নুডলস্, কেক-প্যাস্ট্রি, মোমো, পিৎজা, বিরিয়ানি ইত্যাদি ঢুকে পড়েছে। রাত্রে খাবারেও বিজ্ঞাপনের প্রভাব পড়েছে। নেমন্তন্ন বাড়ির খাবারের পদগুলোও কবে যেন পরিবর্তিত হয়ে গেছে!

বর্তমান প্রজন্মকেই দেখুন, কেক-প্যাস্ট্রি, আইক্রিমে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে চিনি এবং অন্যান্য ক্ষতিকর জিনিস থাকে। এছাড়া পয়সা খরচ করে আমরা বাসি, অস্বাস্থ্যকর খাবার কিনছি। প্যাকেটের ফলের রস, ইনস্ট্যান্ট স্যুপ, মিল্কফোজ, গ্র্যানোলা বার, পাঁউরুটি, মেয়েনিজ, নানারকম চিপস্, কেচআপে বাজার ভরে গেছে। এগুলো কী দিয়ে তৈরি সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্যাকেটের পেছনে দেওয়া থাকে, যা চরম বিভ্রান্তিকর। বিস্কুটের প্যাকেটে বড়ো বড়ো কাজু বাদাম, মাখন দুধের ছবি দেখে আমরা কিনে থাকি। প্যাকেটে লেখা থাকে কাজু-বাদামের মতো, দুধের মতো, ফলের মতো, মাখনের মতো খেতে রসায়ন ব্যবহার করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরাও ওইসব খাবার খেতে খুব ভালোবাসে। বেশিরভাগ প্যাকেটবন্দি খাদ্যে পাম তেল আর চিনি ভর্তি থাকে। সেগুলির স্বাদও প্রাকৃতিক নয়, এক্ষেত্রেও কৃত্রিম রসায়ন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এগুলো দেওয়া নানান খনিজ বিজ্ঞপ্তিতেও আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

এখন এই পরিস্থিতিতে আমরা কী করব? সহজ অথচ পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যকর অনেক খাবার আমাদের আছে। ব্যবহারের অভাবে সেগুলো ভুলতে বসেছি। বিশেষ করে আমাদের ছেলে-মেয়েদের পারম্পরিক খাদ্যের পরিবর্তে অস্বাস্থ্যকর দামি খাবরের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। কম বয়সিরা এতে অসুস্থতার শিকার হয়ে পড়ছে।

রান্নাঘর মূলত মহিলারাই দেখে থাকেন, তাহলে কিছু সুস্বাদু, পুষ্টিকর অথচ কম সময়, কম পরিশ্রমের রান্না আমরা সহজেই করতে পারি। যেমন— বেশ কয়েক রকম সবজি, গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে পোলাও, নোন্‌তা সুজি, চিঁড়ের পোহা, আলু-শশা-দই দিয়ে রায়তা, নোনতা সিমুই, আলু-সেদ্ধ, ছোলা, শশা, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, টমেটো দিয়ে আলুকাবলি, রুটি-তরকারি, সেদ্ধভাত, দই-চিঁড়ে, ঝালমুড়ি, লুচি-পরোটা ইত্যাদি। আমাদের জলখাবারের ভাণ্ডার কিন্তু বিশাল।

কোম্পানিগুলি আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে দুর্বল, অসুস্থ করতে চাইছে। ওইসব খাবারের মধ্যে অনেকগুলি তাদের দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ সেগুলো নিয়ে ওরা ভারতে অবাধে ব্যবসা করে চলেছে। সেজন্য মায়েরা সচেতন হতে হবে। নিজেদের সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য আমরা আমাদের পারম্পরিক খাদ্যাভ্যাসের দিকে ফিরে যাব। □

শরীরে অক্সিজেন বাড়াবার ঘরোয়া পরামর্শ

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়াকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় হাইপোক্সিয়া বলে। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু সঞ্চালনে দরকার অক্সিজেন। ফুসফুসের শ্বসনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তের লোহিত রক্তকণিকা এই অক্সিজেন বহন করে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয়। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গেলে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিকল হতে শুরু করে।

করোনা ভাইরাসের আক্রমণে সবার আগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের ফুসফুস। আহত ফুসফুস বাতাস থেকে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সংগ্রহের ক্ষমতা হারাতে থাকে। ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। মানবশরীরে অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপের নির্দেশক হলো 'অক্সিজেন স্যাচুরেশন'। আমরা শ্বাসগ্রহণ করার পর ফুসফুসের বিশেষ ধরনের ফাঁপা কোষে বাতাস প্রবেশ করে। বায়ুভর্তি ফাঁপা কোষগুলোর নাম 'অ্যালভিওলি'। এখানে রক্তের বাতাসের একটি লেন-দেন ঘটে। রক্তে হিমোগ্লোবিন নামের একটি উপাদান আছে। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে আবদ্ধ হতে পারে। শরীরের কোষগুলো খাবার থেকে সংগৃহীত উপাদানকে ভেঙে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। উৎপাদিত শক্তি দিয়ে কোষগুলো নিজের কাজ আমৃত্যু চলমান রাখে। দেহের কোষ থেকে প্রতিনিয়ত একটি বর্জ্য তৈরি হয়, যার নাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড। হিমোগ্লোবিন শরীরের থেকে বর্জ্য কার্বন ডাই অক্সাইডকে বহন করে অ্যালভিওলিতে নিয়ে আসে। অ্যালভিওলির দেওয়ালে অতিসূক্ষ্ম এই জালিকার সংস্পর্শে রক্তনালি এলে রক্তের হিমোগ্লোবিন বাতাসের অক্সিজেনকে নিজের সঙ্গে আটকে নেয় এবং বহন করে কার্বন অক্সাইডকে বাতাসে মুক্ত করে দেয়। ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হলে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বর্জনের কাজটি ব্যাহত হয়। এতে একদিকে রক্তে অক্সিজেন কমে যায়। অন্যদিকে কমে শরীরের কোষগুলোর কাজ করার ক্ষমতা। কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে কোষগুলো বিষক্রিয়ার শিকার হয়। একজন সুস্থ মানুষের শরীরে অক্সিজেন স্যাচুরেশনের স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ৯৫-১০০। এই মাত্রা ৯৪-এর কম হলে সতর্ক হতে হয় এবং ৯২-এর

কম হলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ঘরোয়া পরামর্শ : দেহের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা বৃদ্ধির উপায় : ১. পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম। আসলে, দুর্বল মানের ঘুম দ্রুত অসুস্থতার দিকে ঠেলে দেয়। ঘুম ও দেহের প্রতিরক্ষা খুব নিবিড়ভাবে যুক্ত। ২. বেশি পরিমাণে ফলমূল, শাকসবজি, বাদাম, বীজ এবং লেবু জাতীয় খাবার খাবেন যেগুলো পুষ্টিকর এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা ক্ষতিকারক রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে আপনাকে লড়তে সহায়তা করবে। ৩. স্বাস্থ্যকর ফ্যাট খান, যা আপনি পাবেন অলিভঅয়েল এবং সামুদ্রিক মাছের স্বাস্থ্যকর চর্বি যা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। অলিভ অয়েল, যা অত্যন্ত প্রদাহ বিরোধী, যা হৃদরোগ এবং টাইপ টু ডায়াবেটিসের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের হ্রাসের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও, এর প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলো আপনার শরীরকে ক্ষতিকারক রোগজনিত ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাসগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করতে পারে। ৪. রোজ একটি প্রোবায়োটিক পরিপূরক খাবার খান। এই খাবারগুলোর মধ্যে টক দই অন্তর্ভুক্ত। ৫. শর্করাযুক্ত খাবার কম খান। ৬. পরিমিত ব্যায়ামে নিযুক্ত হন। ৭. হাইড্রেটেড থাকুন বা পর্যাপ্ত জল খান। ৮. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ৯. কিছু পরিপূরক খাবার-যেমন, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, রসুন, হলুদ, জিরার মতো মসলা রান্নার সঙ্গে যোগ করুন।

- **পাতিলেবু :** অক্সিজেনের ঘাটতি মেটাতে যে সমস্ত খাবার খাবেন, তার মধ্যে প্রথমেই থাকবে পাতিলেবু। পাতিলেবু অ্যাসিডিক হলেও তা শরীরের মধ্যে গিয়ে অ্যালকালাইন হয়ে যায়। এর ভিটামিন সি দ্রুত সর্দিকাশি, ফ্লু, অ্যাসিডিটি, বুক জ্বালার থেকে মুক্তি দেয়।

- **ব্রকোলি :** বিভিন্ন ফ্লু থেকে নিরাপদে রাখতে পারে তেমনই শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণেও এটি কার্যকরী।

- **বাদাম ও কিশমিশ :** আমন্ড, কাজু ইত্যাদি শরীরে অ্যালকালাইনের মাত্র বাড়ায়। এছাড়া কিশমিশে থাকা ভিটামিন এবিসি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রক্ত চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে রক্তচাপের মাত্রা স্বাভাবিক রাখে। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ায়। এছাড়া মিষ্টি আলু, টকদই, তরমুজ, ক্যাপসিকাম, পালংশাক, পাকাকলা, খেজুর ইত্যাদি ফল খুব উপকারী।

- **অঙ্কুরিত ডাল বা কাঁচা ছোলা :** সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শরীরে পুষ্টির জোগান দিতে কাঁচা ছোলা, অঙ্কুরিত ডালজাতীয় খাদ্য খুবই উপকারী। দেহের ক্ষতিকারক টক্সিন উপাদানগুলো বের করে দিয়ে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি মেটায়।

এইসব অক্সিজেন সমৃদ্ধ খাবারগুলো আপনার রক্তে অক্সিজেনের স্তর বাড়াতে সহায়তা করবে। ▯

পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডির তুনতুড়ি গ্রামে জলের দাবিতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ।

গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ রাজ্য

হীরক কর

২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই রাজ্যের শাসক দলের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল, গাঁয়ের ঘরে-ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। গুজরাট যেখানে পুরো কাজ সেরে ফেলেছে, পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে বহু যোজন দূরে। এ রাজ্যে আবার কার্যত এক প্রকল্প চলেছে দুই নামে— কেন্দ্রের 'জল জীবন মিশন', রাজ্যের দেওয়া নাম 'জলস্বপ্ন'। অংশীদারি সমান সমান।

চৈত্রের শুরুতেই তেতে উঠতে শুরু করে ছোটনাগপুর মালভূমি ঘেঁষা রাজ্যের পশ্চিমাংশ। গরম যত বাড়ছে, জলস্তর তত নামছে। যেখানে জল পাওয়া যায়, সেখানেও জলের বেগ কমে যাচ্ছে। পুরুলিয়ার মানবাজারে রাস্তার কলের জলই বহু মানুষের সম্বল। সেই জলের বেগ কমে যাওয়ায় পথ অবরোধ হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে বহু গ্রামের বাসিন্দাদেরই অনেক দূরে গিয়ে জল আনতে হচ্ছে। বীরভূমের নানা এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে গিয়ে পানীয় জল নিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েছেন তৃণমূলের সাংসদ ও বিধায়কেরা।

রাঢ়বঙ্গে সবচেয়ে বেশি জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে বাঁকুড়ায়। সেখানেও বিষ্ণুপুরের রাধানগরের বাসিন্দাদের আক্ষেপ, দেড় বছর ধরে অধিকাংশ বাড়িতে জল আসছে না। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর মেনে নিচ্ছে, বেশি সংযোগ দেওয়ায় জলের চাপ কমে গিয়েছে। ভোটের মুখে নতুন পাইপ বিছিয়ে জলের চাপ বাড়ানো হবে বলে আশ্বাসও দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যে নদীয়া জেলা পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ায় এক নম্বরে রয়েছে। কাজ শুরু না-হওয়া লাক্ষাদ্বীপকে বাদ দিলে জাতীয় তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে তালিকার একেবারে নীচে। জাতীয় গড় যেখানে ৬০ শতাংশ ছুঁতে চলেছে, এ রাজ্য এখনও ৩২ শতাংশের নীচে আটকে রয়েছে। নদীয়াই রাজ্যের একমাত্র জেলা, যেটি লক্ষ্যমাত্রার ৬০ শতাংশ পেরোতে পেরেছে।

রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে থাকা শুখা জেলা বাঁকুড়া রয়েছে ৪৮ শতাংশের আশপাশে। সেখানকার ছবিটা কেমন? রানিবাঁধের হলুদকানালি পঞ্চায়েতের মালবেড়া গ্রামের দুলালি মাহাতোর আক্ষেপ, কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁদের বাড়ির পাইপলাইনে জল আসা বন্ধ। ব্লক অফিসে দৌড়েও সুরাহা হয়নি। পাশের দুই জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর আর পুরুলিয়া রয়েছে তালিকার তলানিতে, তাদের অবস্থা আরও খারাপ। পুরুলিয়ায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ হয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। একথা অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পুরুলিয়া জেলার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুপ্রিয় চক্রবর্তী। তাঁর অবশ্য অভিমত, '২৪ সালের মার্চ মাসের আগেই পুরুলিয়া জেলায় পানীয় জলের কাজ একশো শতাংশ শেষ হবে। সে আশা অবশ্য এখনই দেখছেন না 'আনন্দম' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা। তারা পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ব্লকের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে পানীয় জল প্রকল্পগুলোর তদারকি করছেন। এ ব্যাপারে বান্দোয়ানের বিডিয়ো কাশিফ সাবির 'আনন্দম'-এর ওপর ভরসা

রেখেছেন। তিনিও পিএইচই-র কাজে তিতিবিরক্ত। তাঁর মতে, পিএইচই যাদের দায়িত্ব দিয়েছে তারা কাজ ঠিকমতো করছেন না, ফলে এই গরমে জলের হাহাকার রয়েই গেছে পাহাড় ঘেরা বান্দোয়ানের জনজাতি এলাকায়। 'আনন্দম'-এর সভাপতি শ্যামল সান্যাল তপ্ত ভাষায় জানালেন, সল্টলেকের পিএইচই ভবন, নবান্ন, পুরুলিয়ার জাইকা ভবন ঘুরে ঘুরে তাদের জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে গেছে। মন্ত্রীকে চিঠি লিখেও কাজ খুব একটা এগোয়নি। যে কাজ একমাসে হয় তা তিন মাস, এমনকী এক বছরেও হয়নি। তবে, হ্যাঁ, সময় লেগেছে, কিন্তু আমরা কিছু জায়গায় পানীয় জলের কাজ আদায় করতে পেরেছি।

এরই মধ্যে ২০২২-২৩-এর আর্থিক বছরে কাজ না হওয়ায় পুরুলিয়া জেলা থেকে কয়েকশো কোটি টাকা কেন্দ্রে ফেরত চলে গিয়েছে বলে খবর। আর তা কেন হলো, খতিয়ে দেখতে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পুরুলিয়ার পিএইচই বাংলোয় ঘাঁটি গেড়ে ছিল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। এই নিয়ে জেলা প্রশাসনে ব্যাপক হইচই হয়। দফায় দফায় বৈঠক হয় জেলা পরিষদ এবং জেলাশাসকের দপ্তরে। পিএইচই-র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুপ্রিয় চক্রবর্তী অবশ্য এই তথ্য অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। জেলাশাসক রজত নন্দা বলেন, ২০২-এর মধ্যেই পুরুলিয়া জেলার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে। কয়েকটি জায়গায় নল বাহিত জলের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দোরগোড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক কবলিত এলাকা, যেখানে পরিশ্রুত পানীয় জল দিতে না পারায় পরিস্থিতি বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে। এই মানচিত্রে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনার বেশিরভাগ এলাকা ছাড়াও রয়েছে পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়ার অনেকখানি। এর মধ্যে নদীয়া বাদে শুধু পূর্ব বর্ধমানে সংযোগ দেওয়ার কাজ ৪০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। বাকি প্রায় সব জায়গাতেই কাজ হয়েছে ২০ থেকে ৩৫ শতাংশের মধ্যে। বেশ কিছু ব্লকের অনেক এলাকায় পানীয় জলের তেমন ব্যবস্থা নেই। বেআইনি জলের কারখানাও গজিয়ে উঠেছে প্রচুর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পরিস্থিতিও প্রায় একই।

এই তালিকার একেবারে নীচে রয়েছে মালদহ, যেখানে কাজ ২৫ শতাংশেরও নীচে। সেখানকার পরিস্থিতি গোটা উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। দার্জিলিঙের অবস্থাও প্রায় উনিশ-বিশ। দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে জলের সমস্যা বস্তুত বহু দশকের। বাম আমলে পাহাড়ের জল সমস্যা মেটাতে বালাসন প্রকল্পের ঘোষণা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। আজও সোনাদা, সুখিয়াপোখরি থেকে লেবং, আলগাড়ার রাস্তায় ঝোরায় ভরা জলের ড্রাম টয়ট্রেনের লাইন ধরে চাকা লাগানো পাটাতনে বসিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

কালিম্পং জেলার গোরুবাথান ব্লকের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম দূরখোলা। লাভা থেকে ১৫ কিলোমিটার। ৮০টি পরিবারের বাস। কিন্তু পানীয় জলের নিদারুণ অভাব। পিএইচই এখানে 'জল ভরো জল ধরো' প্রকল্প করেছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বৃষ্টি না হলে জলাধার শুকিয়ে যায়। ফলে পানীয় জলের অভাব থেকেই গেছে। গ্রামের প্রধান সি.ডি. গুরুং জানিয়েছেন, সরকারি দপ্তরে বারবার দরবার করেও পানীয় জলের বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়নি। বিডিয়ো এসে সরেজমিনে এলাকা দেখেও যাননি। ফলস্বরূপ, সপ্তাহে চারদিন এই অঞ্চলে জল পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গের সর্বত্র প্রায় একই অবস্থা। উত্তরবঙ্গে ৪০ শতাংশের বেশি সংযোগ দেওয়ার কাজ হয়েছে একমাত্র আলিপুরদুয়ারে।

নীতি আয়োগের রিপোর্ট বলছে, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই ও হায়দরাবাদ-সহ দেশের ২১টি শহরে ভূগর্ভস্থ জল প্রায় শেষ হতে চলেছে পরের বছরেই। তীব্র জল সংকটে পড়বেন অন্তত ১০ কোটি মানুষ। নীতি আয়োগের রিপোর্ট থেকে আরও জানা যাচ্ছে, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রবল সংকটে পড়বেন ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ। ভারতের ইতিহাসে এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৪০ কোটি। এই বিপুল জনসংখ্যার চাপ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ছে প্রকৃতির উপর। এছাড়া জল সংরক্ষণের বিষয়ে বেশিরভাগ মানুষের সাধারণ সচেতনতার অভাব জল সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ বলে মনে করছেন বিশেজ্ঞরা।

কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ সংস্থার সমীক্ষা বলছে, ভারতে ৪০ শতাংশ জলের উৎস ভূগর্ভস্থ জল। নাসা এবং জার্মানির অ্যারো স্পেস সেন্টারের এক যৌথ সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে ভূগর্ভস্থ জল হ্রাসের অন্যতম কারণ কৃষিক্ষেত্র ও দৈনন্দিন কাজকর্মে জলের যথেচ্ছ ব্যবহার। ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে ধান ও গম চাষে যে পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল খরচ হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সেই পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হওয়ায় জলসমস্যা বেড়েই চলেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ বলছে, ভারতে প্রায় ১৭ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। বিশুদ্ধ জল পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। সমাজের সকল অংশের মানুষ যাতে পরিশ্রুত জল পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাটির উপরের জলপ্রবাহের হার কমে যাওয়া, যথেচ্ছ ও অপরিকল্পিত ভাবে ভূগর্ভের জলের উত্তোলন, মিষ্টিজলের দেদার অপচয় ইত্যাদি জলসংকটের মূল কারণ। আজ মিষ্টি জলের ভাণ্ডার বাড়ন্ত।

মাটির তলার একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের নীচে এই জল পাম্প দিয়ে তোলার আইন রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিগমের কিছু লোকের সহায়তায় সেই দূরত্বের অনেক আগেই মাটির স্তর থেকে জল তুলতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। এতে চাষির খরচ অনেক কমে যাচ্ছে। কিন্তু এর ফলে মাটির ওপর স্তরের জল অনেক কমে যাচ্ছে। গ্রামের দিকে জল অপচয়ের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সরকারি দপ্তরগুলোর সমন্বয়ের অভাবে সেই নির্দিষ্ট দূরত্ব মানা হচ্ছে না। যেমন পুরুলিয়ার বহু গ্রামে চাইল্ড ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় ছোটোদের স্কুল রয়েছে। সেখানে সাক্ষরতা মিশন সোলার সিস্টেমে সাবমার্সিবল পাম্প বসিয়ে জল তুলছে। অথচ, ওই একই ভাবে এক মিটারের মধ্যে রয়েছে পিএইচই— একই রকম পানীয় জলের প্রকল্প। এর ফলে আগামীদিনে পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। জেলা প্রশাসনের কর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তাঁরা বিষয়টির ভয়াবহতা বুঝে উঠতে পারেননি। ফলে একই জায়গায় পাশাপাশি চলছে দুটি ভূগর্ভস্থ জলের প্রকল্প।

গোটা দেশে ভূপৃষ্ঠস্থ জলপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের সংখ্যা ৬,০১, ০০০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৫,৯২,০০০-এ।

যার প্রভাব দেশের ৪.৮৯ মিলিয়ন হেক্টর কৃষিযোগ্য জমিতে পড়েছে। ভূপৃষ্ঠের জল কমা মানে মাটির নীচের জলের উপর নির্ভরশীলতা বাড়া। তাই মাটির নীচে থাকা জলস্তরে টান পড়বেই।

নাসার উপগ্রহ-চিত্রে ধরা পড়েছে, বিশ্বের ৫ লক্ষ জলাধারের জলস্তর হুহু করে নামছে। জলের ব্যবহার ও অপচয় বাড়তে থাকায় এই মারাত্মক পরিণতি। তার জেরে টান পড়ছে মাটির নীচে জলভাণ্ডারে। ভারত, মরক্কো, ইরান, স্পেনে মারাত্মক জলসংকট ঘনিয়ে আসছে।

ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক বছরে দেশের খরাপ্রবণ রাজ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। কারণ, রোজ কয়েক কিলোমিটার হেঁটে জল আনতে যায় পড়ুয়ারা। পাছে সেই কাজে বাধা পড়ে, তাই একটু বড়ো হতেই মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ, জল আনতে যাওয়া শুরু।

ভূগর্ভস্থ জল ফুরিয়ে আসছে। নলকূপ পাতকুয়ো— পড়ে রয়েছে শুকনো। নিঃশেষিত 'অ্যাকুইফার' সেচে জল তুললেও মিলছে আর্সেনিক। জলকষ্ট ছাড়াও, জলাভাবে আনুষঙ্গিক বৃহত্তর সমস্যাও জুটছে। ইউনিসেফের জার্নাল অনুযায়ী, ২০২৫-এই বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ জলসংকটে ভুগতে শুরু করবেন। অর্থাৎ অতিমারি অতিক্রান্ত হওয়ার অপেক্ষাই শেষ নয়, এর পরে মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা হবে পানীয় জলের অভাব। জল না মিললে সোনার ফসল কি আর ফলবে? আসবে খাদ্যসংকট।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহান্নটি দেশের একশো আটজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গড়েছিল জলবায়ু পরিবর্তন-বিষয়ক উপদেষ্টামণ্ডলী। গত ৮ আগস্ট প্রকাশিত প্রতিবেদনে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, এই প্রথম পৃথিবীর প্রধান খাদ্য উৎপাদক দেশগুলোতে একসঙ্গে জলাভাব হতে চলেছে। ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। কোপ পড়বে গরিবের উপরেই বেশি। তবে এই প্রতিবেদনের অন্যতম প্রণেতা, নাসার সিন্থিয়া রোজেনৎজোয়াইগ বলছেন যে, এখনই সব দেশ পূর্ণ উদ্যমে সচেষ্ট হলে জলসংকট রোখা যেতে পারে।

ভারতে চাষের পঁচাশি শতাংশ ভূগর্ভস্থ জলস্তরের উপর নির্ভরশীল। কৃষিতে ভূগর্ভস্থ

> **ভূগর্ভস্থ জল বাঁচানোর একটাই উপায়— ভূগর্ভস্থ জলের অপচয় বন্ধ করা। মানুষের মধ্যে সচেতনতা না থাকলে এই অপচয় বন্ধ করা যাবে না। প্রয়োজনে রাস্তায় নেমে মানুষের মনে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে, বোঝাতে হবে আসন্ন জলসংকটের বিপদ কতটা ভয়ঙ্কর।**

জলের অতি-ব্যবহারের ফলে পঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমদিকে ভূগর্ভস্থ জলের প্রথম স্তর আগামী পনেরো বছরে ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর একটা কারণ, যে সব অঞ্চলে চিরকাল গম, ভুট্টা, বাজরা-জাতীয় কম পিপাসু ফসলের চাষ হতো, সেখানে এখন ধান ও আখের চাষ হচ্ছে। এক কিলোগ্রাম গম তৈরি হতে লাগে ১৩০০ লিটার জল। ভুট্টা ও বাজরার মতো ফসল ফলাতে আরও কম জল লাগে। আর ১ কেজি ধান চাষ করতে লাগে ৩৪০০ লিটার জল। সেখানে এক কিলোগ্রাম মাংস হতে ১৫,৫০০ লিটার জল লাগে। থালার পাশে যাতে জলভরা গেলাসটি থাকে, খাদ্যশস্য কিংবা পশুখাদ্যের জোগান ধরে রাখতে যদি হয়, তবে খাওয়ার পাতে বসেও ভাবতে হবে, কতটা জল গিয়েছে এই খাবার উৎপন্ন করতে। কথাটা যদি বিশ্বাস না হয়, মনে করুন কয়েক সপ্তাহ আগে তেষ্টার জলের জন্য চেন্নাইবাসীদের লম্বা লাইন।

জলাভাব থেকে বাঁচতে কয়েকটা দীর্ঘমেয়াদি উপায় রয়েছে, যেমন গাছ লাগানো। একটা-দুটো নয়, এক লক্ষ কোটি গাছ। গ্রিনহাউস গ্যাস কমিয়ে বায়ুমণ্ডলের তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে তার চাইতে কমে হবে না। আর দরকার জীবাশ্ম-জ্বালানির বদলে বিকল্প শক্তির (সৌর, বায়ু, সমুদ্রতরঙ্গ, পারমাণবিক) ব্যবহার। বাতাস থেকে যন্ত্র দিয়ে কার্বন- ডাইঅক্সাইড নিষ্কাশনও করা যেতে পারে। কিন্তু গাছ রাতারাতি বড়ো হয় না। বিদ্যুতে অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার করতে আজ থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করলেও কাজ হতে সময় লাগবে। অথচ ভারত-সহ সতেরোটি দেশে জলসংকট এখনই শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকে মনে করেন, ভারতের হাতে পাঁচ বছরের বেশি সময় নেই। যে কাজগুলো এখনই করলে জলসমস্যা খানিকটা মিটতে পারে, সেগুলি হলো জলের সঞ্চয়, অপচয় থামানো, জলসৃজন ও ন্যায্য জলবণ্টন।

মানুষের মধ্যে সচেতনতা না থাকলে এই অপচয় বন্ধ করা যাবে না। তার সঙ্গে এই জল বাঁচানোর জন্য আমাদেরই রাস্তায় নামতে হবে। ভূগর্ভস্থ জল বাঁচানোর একটাই উপায় সেটা হলো ভূগর্ভস্থ জলের অপচয় বন্ধ করা।

আমাদের মনে রাখতে হবে, এই পৃথিবীর মোট আয়তনের ২.২৫-২.৭৫ শতাংশ পরিস্রুত জল। এর মধ্যে ১.৭৫-২ শতাংশ জল মেরুপ্রদেশে জমে আছে। তাহলে পড়ে থাকলো ০.৫-০.৭৫ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জল। বৃষ্টির জল খুব কম পরিমাণে মাটির নীচে যায়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের এখন সময় এসেছে জল বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা নেওয়ার এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বারেবারে যে বিষয়টি বিভিন্ন মহল থেকে সামনে উঠে এসেছে তা হলো, বিপুল পরিমাণে গাছ লাগানো। গাছ ভূমিক্ষয় রোধ করে, বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে। ভূগর্ভস্থ জলের ঘাটতি সামাল দিতে পারে গাছই।

২০২৪ সালের মধ্যে সব ঘরে জল দেওয়ার স্বপ্ন ফিরি করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। কিন্তু শুধু পাইপলাইন বিছিয়ে দিলেই তো কাজ মিটবে না। সাবমার্সিবল পাম্প দিয়ে জল তোলা, পরিশোধন ও পর্যাপ্ত জলাধারে তা সঞ্চিত রাখার যে বিপুল পরিকাঠামো গড়ে তোলা দরকার, তা হতে এখনও বিস্তর কাঠখড় পোড়ানো বাকি। প্রাকৃতিক বাধা তো আছেই, রাজনৈতিক বিরোধও উপরি বিপদ। আপাতত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এ রাজ্যের ঘরে-ঘরে জল তাই শুধুই স্বপ্ন! ■

জল দূষণেই কি জীবনের অবলুপ্তি?

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

শুধু লবণাক্ত জলই নয়, ভূপৃষ্ঠস্থ জলও আজ পানযোগ্য নয়। মর্ত্যের দূষণকারীরা ছড়িয়ে পড়েছে সুরলোকেও। পুণ্যসলিলা পতিতপাবনী সুরধনী যেন নিজেই আজ পতিত! যাকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন— গঙ্গাদূষণ। মেঘের পাখনা থেকে ঝরছে অম্লবৃষ্টি! বিজ্ঞানের বাণে পাতাল ফুঁড়ে উৎসারিত জলেও কোথাও সেঁকো বিষ বা আর্সেনিক, কোথাও বিষাক্ত ফ্লোরাইড বা নাইট্রেট!

কিন্তু জল ছাড়া জীব বাঁচে না, তাই জলের অপর নাম জীবন। জীবকোষ ও রক্তের প্রধান উপাদান জল। আমাদের দেহের শতকরা সত্তর ভাগ জল। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় রেচন পদার্থের সঙ্গে দেহ থেকে যে জল নির্গত হয় তা পূরণের জন্য আমাদের প্রতিদিন অন্তত ২ লিটার জল পান করা উচিত। জলের অভাবে জীবের জৈবিক ও জৈবনিক প্রক্রিয়ার ছন্দপতন ঘটে এবং অবশেষে মৃত্যু হয়।

প্রতি বছর পৃথিবীতে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে মারা যায়। এখনও পৃথিবীর একশো কোটিরও বেশি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় দল থেকে বঞ্চিত। পৃথিবীর শতকরা আশি ভাগ জল। তবু কেন পানীয় জলের এই সংকট?

পৃথিবীর মোট জল সম্পদের ৯৭.২ শতাংশ সমুদ্রের লবণাক্ত জল। ২.১৪ শতাংশ কঠিন জল যা পর্বতশৃঙ্গ এবং মেরু অঞ্চলদ্বয়ের মুকুটমণি। এই সব জল সরাসরি মানুষের কোনো কাজে আসে না। শুধুমাত্র নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর, দীঘি ও জলাশয়ের জল এবং ভূগর্ভস্থ জলের সর্বাধিক তিন-চতুর্থাংশ জলই মানুষের ব্যবহারযোগ্য যা পৃথিবীর মোট জল সম্পদের মাত্র ০.৬ শতাংশ। ভৌগোলিক কারণে খরাপ্রবণ এলাকায় কম বৃষ্টিপাতের দরুন গ্রীষ্মকালে জলাশয় শুকিয়ে যায়, মাটির গভীরে জলস্তর নেমে যায়। বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকতে হয় আকাশের দিকে। যদি মেঘ হয় নিরুদ্দেশ, মানুষের অবস্থা শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'।

ভূপৃষ্ঠস্থ মিঠে জল পরিশোধন না করে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা আদৌ উচিত নয়। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট— উভয় কারণে এই জলের সঙ্গে রোগজীবাণু, কৃমি, কৃষি-শিল্প পারমাণবিক চুল্লির বর্জ্য পদার্থ, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, কীটনাশক ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ অনবরত মিশছে।

প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে জনসংখ্যা। বেড়ে চলেছে কৃষির প্রসার, নগরায়ণ ও শিল্পায়ন। ফলে বাড়ছে জলের চাহিদা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জল দূষণ। বিগত দুই শতকেই জলের চাহিদা বেড়েছে ৩৫ গুণ। উন্নত দেশগুলি রাসায়নিক পদ্ধতিতে জল পরিশোধিত করে পানীয় জল সরবরাহ করে। কিন্তু অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলি প্রতিটি নাগরিকের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা এখনও করতে পারেনি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা 'জাতীয় জল জীবন মিশন' প্রকল্প শুরুর আগে ভারতের ৪০ শতাংশ গ্রামে অর্থাৎ ২.৩১ লক্ষ গ্রামে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছয়নি। তাই বিকল্প হিসেবে মানুষ টিউবওয়েল বা পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জলকে পানীয় জল রূপে ব্যবহার করছে। এটা অবশ্যই ভূপৃষ্ঠস্থ জল অপেক্ষা অনেক বেশি নিরাপদ, কিন্তু এই পাতালের জলেও কোথাও কোথাও আর্সেনিকের পরিমাণ বিপদ সীমার উর্ধ্বে!

আর্সেনিক দূষণ : এ যাবৎ পৃথিবীর কয়েকটি দেশ--- ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার, নেপাল, চীন, জাপান, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, মঙ্গোলিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, চিলি, পেরু, ফিলিপাইনস, আর্জেন্টিনা, সাউথ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, গ্রিস, কানাডা, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার কোনও কোনও অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের পরিমাণ সহ্য সীমার চেয়ে বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিশেষ আর্সেনিক প্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত। বাকি উত্তর ও দিনাজপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, কলকাতাতেও আর্সেনিক দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে। West Bengal Voluntary Health Association-এর সমীক্ষা অনুসারে কলকাতার কোনও কোনও অঞ্চলে আর্সেনিকের পরিমাণ সহ্য ক্ষমতার উর্ধ্বে। ওই ৯টি জেলার ৪০টি ব্লকের প্রায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ এই আর্সেনিক দূষণের শিকার!

ভারত ও বাংলাদেশের গঙ্গা ও পদ্মা নদীর অববাহিকায় এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলে আর্সেনিক দূষণ সর্বাধিক। ভূতত্ত্ববিদদের সমীক্ষা অনুসারে আগ্নেয়গিরির লাভাসমৃদ্ধ অঞ্চল এবং পলিমাটি অধ্যুষিত এলাকায় আর্সেনিক দূষণের প্রবণতা বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, All India Institute of Hygiene and Public Health, Arsenic Task Force, Govt of West Bengal এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান, West Bengal Voluntary Health Association প্রভৃতি বিভিন্ন এলাকার জলের নমুনা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে যাচ্ছে। তাদের সমীক্ষা অনুযায়ী উল্লিখিত ৯টি জেলার জলে আর্সেনিকের মাত্রা প্রতি লিটারে ০.০৫ মিলিগ্রাম থেকে ৫০ মিলিগ্রাম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র নির্দেশিকা অনুসারে পানীয় জলে আর্সেনিকের প্রতি লিটারে সর্বোচ্চ পরিমাণ ০.০১ মিলিগ্রাম। সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড— ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। বোঝাই যাচ্ছে, আমাদের রাজ্যের আর্সেনিক উপদ্রুত এলাকাগুলির পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।

আর্সেনিকের উৎস : মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে তিনটি জিনিস অপরিহার্য— বায়ু, জল ও খাদ্য— সেই তিনটিই আজ আর্সেনিক দূষিত এবং এই তিনটির মধ্য দিয়েই আমাদের শরীরে আর্সেনিক সংক্রমণ ঘটছে। পরিমাণে নগণ্য হলেও বিভিন্ন আকরিক বিশেষত সালফাইড আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের সময় আকরিকের অশুদ্ধি থেকে কিছু আর্সেনিক বায়ুতে মেশে যা প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে। কৃষিতে ব্যবহৃত আর্সেনিক ঘটিত অজৈব কীটনাশক থেকে এবং আর্সেনিক যৌগ উৎপাদনকারী কারখানার বর্জ্য পদার্থ থেকে ভূপৃষ্ঠস্থ জল আর্সেনিক সংক্রমিত হচ্ছে। এই জল সমুদ্রে মেশার ফলে সামুদ্রিক মাছে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। জল থেকে শাকসবজিতেও আর্সেনিকের অনুপ্রবেশ ঘটছে। অর্থাৎ আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে আর্সেনিক ঢুকে পড়েছে। তবে মাটির আর্সেনিক বিশোষণ ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি হওয়ায় ভূপৃষ্ঠস্থ জলে আর্সেনিকের পরিমাণ নগণ্য। পুকুর বা জলাশয়ের জলে আর্সেনিক থাকে না। কিন্তু জীবাণুঘটিত কারণে পুকুরের

যা যা করণীয় :

১. উপরোক্ত পদ্ধতিতে পরিস্রুত পানীয় জল পাইপ লাইনের সাহায্যে অতি সত্বর আর্সেনিক প্রবণ এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সমস্ত ব্যয়ভার সরকারকেই বহন করতে হবে। কারণ মানুষের যত রকম চাহিদা, দাবিদাওয়া এবং যত রকম সরকারি পরিষেবা আছে— পানীয় জলের দাবির চাইতে অগ্রগণ্য আর কিছুই হতে পারে না।

২. বিকল্প হিসেবে গভীর নলকূপের জল ব্যবহার করা যেতে পারে। নলকূপের গভীরতা সর্বনিম্ন ১০০ মিটার হওয়া উচিত। কেবলমাত্র ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এবং রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারাই নলকূপের নির্ণয় করা যায়। কোনও কোনও এলাকায় দেখা যায় ৩০-৪০ মিটার গভীরতায় জলে আদৌ আর্সেনিক নেই। অথচ ৫০-৬০ মিটার গভীরতায় আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। আবার অধিক জলোত্তোলনের ফলে জল স্তর নেমে গিয়ে আর্সেনিক স্তর উঠে আসার দরুন আর্সেনিক মুক্ত নলকূপের জলেও পরে আর্সেনিক পাওয়া যেতে পারে।

৩. নলকূপ খননের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে কোনওভাবে জল চুঁইয়ে আর্সেনিক দূষিত স্তরের ভেতর দিয়ে উৎস মুখে না মেশে।

৪. আগামীদিনের কথা, পশ্চিমবঙ্গের নতুন প্রজন্মের কাছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীর দায়বদ্ধতার কথা ভেবে, সামগ্রিক জলদূষণ প্রতিরোধে এলাকায় এলাকায় সংরক্ষিত জলাশয়ের মাধ্যমে, শহরে ছাদের ওপরে বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে ওই জলাধারগুলি যেন ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়ার সুতিকাগারে পরিণত না হয়।

যে জলের অপর নাম 'জীবন', যে জলেই প্রথম প্রাণের সৃষ্টি, সেই জলের দূষণেই কি ঘটতে পারে জীবজগতের প্রাণের অবলুপ্তি?

ফঃ ৪

জল পানের অযোগ্য। ভূগর্ভস্থ জলই আর্সেনিকের প্রধান উৎস।

প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় আর্সেনিক পাওয়া যায় না। এটা একটা ধাতুকল্প। তাই ধাতু ও অধাতু— উভয়ের সঙ্গেই যৌগ গঠন করতে পারে। ভূ-রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী পাইরাইট স্তরে আর্সেনিক সালফারের সঙ্গে রিয়েলগার (As_2S_2) এবং অরপিমেন্ট প্রভৃতি যৌগ এবং (লোহা যুক্ত) ধাতব সালফাইডের সঙ্গে আর্সেনো-পাইরাইটস, (FeAsS), নিকেল আস (NiAsS) প্রভৃতি যৌগরূপে থাকে। ভূগর্ভস্থ অভ্যন্তরীণ তাপে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওই যৌগগুলির থেকে আর্সেনিক মুক্ত হয়ে জলের সঙ্গে মেশে। এছাড়া ভূগর্ভস্থ মাটি ও পাথরে বিভিন্ন আর্সেনাইট, আর্সেনেট, আর্সেলোনাইট্রাইট ও আর্সেলোনাইট্রেট প্রভৃতি যৌগ থাকে। ভূগর্ভ থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় জলোত্তোলনের ফলে ভূগর্ভে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার ফলে বিভিন্ন স্তরে ফাটল দেখা দেয় এবং আর্সেনিক যৌগগুলি অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জলে দ্রবীভূত হয়। মাটির ওপরে নুনের পাহাড়ের গায়ে জমানো আর্সেনিক ধুয়ে ভূগর্ভে বিশাল এলাকা জুড়ে আর্সেনিক স্তরের কোনো ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র পাইরাইটস স্তরে আর্সেনিকের নিশ্চিত উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এবং ভূগর্ভের যে কোনো জায়গায় অল্পবিস্তর আর্সেনিক যৌগ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোনও কোনও জলের নমুনায় খুব সামান্য পরিমাণ Mono Methyl Arsonic Acid (MMA) এবং Dimethyl Arsonic Acid (DMA) পাওয়া গেছে। ভূগর্ভে জৈব আর্সেনিক যৌগের উপস্থিতি সম্পর্কেও বিশেষ তথ্য জানা নেই। তবে এটা বলা যায় অধিক জলোত্তোলন এবং ভূপৃষ্ঠের বিশেষ গঠনের জন্য আর্সেনিক দূষণ ঘটছে।

মানবদেহে আর্সেনিকের প্রভাব : আর্সেনিকের সমস্ত যৌগই বিষাক্ত। মাত্র ৫০ মিলিগ্রাম আর্সেনিয়াস অক্সাইড (As_2O_3) একজন মানুষের মৃত্যু ঘটাতে যথেষ্ট। ত্রিযোজী আর্সেনিক— পঞ্চযোজী আর্সেনিক অপেক্ষা অধিকতর বিষাক্ত এবং জলে অধিক দ্রাব্য। অজৈব আর্সেনিক যৌগ জৈব আর্সেনিক যৌগ অপেক্ষা বেশি বিষাক্ত। আর্সেনিক--- এনজাইমের '-SH গ্রুপের' সঙ্গে বিক্রিয়া করে এনজাইমের ক্রিয়া নষ্ট করে। ক্রেবস চক্রের শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া এতে ব্যাহত হয়। আর্সেনিক পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জটিল যৌগ উৎপাদন করে এবং এটিপি সংশ্লেষণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। প্রতি লিটার জলে ০.০৫ গ্রামের বেশি পরিমাণে উপস্থিত আর্সেনিক যুক্ত জল বেশিদিন পান করলে আর্সেনিকোসিস রোগ দেখা দিতে পারে। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীর পায়ের তলায় ও পায়ে কালো ছোপ ছোপ (Black foot disease) দেখা যায়। পরে হাতের চেটো ও ধীরে ধীরে সারা গায়ে বৃষ্টির ফোঁটার মতো দাগ দেখা যায়। তারপর হাতে-পায়ে ঘা ক্রমে গ্যাংগ্রিনে ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ত্বক ক্যানসারে পরিণত হয়। ধীরে ধীরে লিভার, কিডনি, ফুসফুস ও স্নায়ুতন্ত্র সবটাই আক্রান্ত হয়। রক্তে এসজিপিটি ও এসজিওটি বেড়ে যায়। Hyperpigmentation, Melanosis, Liver fibrosis, Renal failure ও Neuropathy রোগ দেখা দেয়। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মারা যায় না কিন্তু যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে রোগী এগোতে থাকে। আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর চুল ও নখে আর্সেনিক পাওয়া যায়, যার সাহায্যে আর্সেনিকোসিস রোগীকে শনাক্ত করা যায়। আর্সেনিকোসিসের কোনো প্রতিষেধক টিকা বা নির্দিষ্ট ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। চিলেশন থেরাপির সাহায্যে দেহে প্রবিষ্ট আর্সেনিককে দেহ থেকে দূরীকরণের গবেষণা চলছে। বিদেশে এই চিকিৎসায় সাফল্য পাওয়া গেছে। কিন্তু চিলেটিং প্রক্রিয়াটি খুব ব্যয়বহুল। ডাক্তারেরা আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর বিভিন্ন উপসর্গের চিকিৎসা করেন মাত্র। তবে এটাও অত্যন্ত জরুরি। হাতে বা পায়ে ঘা হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়া এবং বায়োপসি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তাহলে দ্রুত ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। আর্সেনিকোসিসের উপসর্গ দেখা দেওয়া মাত্র আর্সেনিক দূষিত জল আর ব্যবহার না করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং প্রোটিন যুক্ত খাবার খেলে রোগী সম্পূর্ণ সেরে যায়। তাই আতঙ্কিত না হয়ে এবং আতঙ্ক না ছড়িয়ে সমষ্টিগত ভাবে প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সব এলাকায় পাইপ লাইনের সাহায্যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় না, ভূগর্ভস্থ জলই পানীয় জল এবং ওই জল ব্যাপকভাবে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেই সব গ্রামীণ এলাকাতেই আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ বেশি। এইসব দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী এবং অপুষ্টিজনিত মানুষরাই আর্সেনিকোসিসের প্রধান শিকার। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, সচেতনতার অভাব এবং বিকল্প পানীয় জলের অভাবে আর্সেনিক দূষণ মহামারীতে পরিণত হতে চলেছে।

আর্সেনিক দূরীকরণ : নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদ্ধতিগুলির সাহায্যে দূষিত জলকে আর্সেনিক মুক্ত করা যায়।

১. **Adsorption (অধি শোষণ) :** দূষিত জলে অধিশোষক যোগ করলে আর্সেনিক অধিশোষকের পৃষ্ঠদেশে শোষিত হয়। সক্রিয় চারকোল একটি উত্তম অধিশোষক কিন্তু এটা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। এর পরিবর্তে উজ্জীবিত অ্যালুমিনাও ব্যবহার করা যায়। রসায়নাগারে মাড়াইয়ের পর ছিবড়া এবং তার ছাই ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে।

২. **Chemical precipitation (অধঃক্ষেপণ) :** জলে আর্সেনিকের পরিমাণ এত কম যে এর একক অধঃক্ষেপণ যতটা কষ্টসাধ্য, 'সহ অধঃক্ষেপণ' ততটাই সহজ। আয়রন সমৃদ্ধ জলে নিজেই ফেরিক হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং ফটকিরি যোগ করে বেশ কয়েক ঘণ্টা রেখে দেওয়ার পর জলকে ফিল্টার করলে সহ-অধঃক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় জল আর্সেনিক মুক্ত হয়।

৩. **Ion exchange process :** জৈব রাসায়নিক যৌগ রেজিনের সাহায্যে এই পদ্ধতিতে জল সম্পূর্ণ আর্সেনিক আয়ন মুক্ত হয়। এই পদ্ধতিটিও ব্যয়বহুল।

৪. **Membrane filtration :** বিপরীত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত পর্দার সাহায্যে অন্যান্য অশুদ্ধির সঙ্গে আর্সেনিকও জল থেকে মুক্ত হয়। এই পদ্ধতি বিপুল চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়।

৫. **Phyto remediation :** বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে Ludwigia parviflora, Ageratum conyzoides প্রভৃতি উদ্ভিদ মাটি ও জল থেকে আর্সেনিক শোষণ করে। তাই এই জাতীয় উদ্ভিদ আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় রোপণ করলে আর্সেনিক দূষণের সঙ্গে সঙ্গে সবুজায়নের ফলে বায়ুদূষণও কমবে।

অধিশোষণ এবং সহ-অধঃক্ষেপণ—এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয়েই সম্পূর্ণ নিরাপদ পানীয় জল পাওয়া সম্ভব। দূষিত জলে Activated Alumina, ফেরিক হাইড্রক্সাইড এবং ব্লিচিং পাউডার বা ক্লোরিন যোগ করার পর জল ফিল্টার করলে নিরাপদ পানীয় জল পাওয়া যাবে। ■

জলের যথাযথ ব্যবহার ও সংরক্ষণই পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে

সৌরভ সিংহ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বছর ৪৮-এর কমলা দেবী ও বর্ধমানের পূর্বস্থলীর ৪২ বছরের শিক্ষিকা মানসী দেবীর মধ্যে হয়তো অনেকটাই মিল। দুজনই ফ্লোরাইড বিষক্রিয়ায় ভুগছেন এবং লাঠি ছাড়া তারা চলতে পারেন না। আবার মুর্শিদাবাদের মিন্টু ও হুগলির সাহেব দুইজনেই মিনামাটা রোগে আক্রান্ত। দুই ক্ষেত্রেই কারণটা হয়তো সবাই কম-বেশি জানি। আসলে আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রাধান্য বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে ও লোভের বশবর্তী হয়ে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে যথেচ্ছভাবে প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ, শোষণ ও ধ্বংস করে চলেছে। আবার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির জন্য প্রকৃতির বুকে যথেচ্ছ নগরায়ণ ও শিল্পায়ন উভয়ই ঘটিয়ে চলেছে। তারই কুফল আমরা হাতেনাতে ভোগ করছি।

এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের অনেকগুলি রাজ্যে পানীয় জলের সরবরাহ সংকটপূর্ণ জায়গায় আছে। প্রতিনিয়ত ভূগর্ভস্থ জল ভারী ধাতুগুলির দ্বারা দূষিত হয়ে চলেছে এবং আমরা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত সেই জল পান করে চলেছি।

জলের সংকট ভারতের নতুন সমস্যা নয়। ৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে, গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষ তাদের পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে ভূপৃষ্ঠের জল (surface water) — পুকুর বা নদীর উপর নির্ভর করতেন। ফলস্বরূপ ব্যাকটেরিয়া-দূষিত জলের কারণে ডায়রিয়া, আমাশয় ও কলেরার মতো রোগগুলি মহামারীর আকার নিত। এই সমস্যা সমাধানের জন্য; সরকার ভূগর্ভস্থ জল বিকল্প হিসেবে বেছে নেয়। সরকার ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস এমার্জেন্সী ফান্ড (UNICEF) এবং বিশ্বব্যাংকের মতো সংস্থাগুলির সাহায্যে গ্রামগুলিতে টিউবওয়েল এবং হ্যান্ডপাম্প সরবরাহ করা শুরু করে : ইউনিসেফ প্রোগ্রামটি শুরু করে এবং সর্ব প্রথম ৯ লক্ষ টিউবওয়েলের জন্য অর্থ প্রদান করে। পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টিউবওয়েল স্বচ্ছ পানীয় জল সরবরাহের জন্য নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ঘটনা সামনে আসে। চার জেলা থেকে প্রায় ৩৩ জন আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হন। সেই থেকেই ক্রমাগত ধাতব পদার্থ ও রাসায়নিকের প্রভাবে জলের মধ্যে বিষক্রিয়া ঘটনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জল দূষণকারী ভারী

ধাতুগুলির মূল উৎস হলো বিভিন্ন কলকারখানা; ধাতবশিল্প, রাসায়নিক প্রস্তুতিকরণ, পেস্টিসাইড শিল্প ও খনিজ পদার্থের খনন ইত্যাদি। মূলত, যেসব উপাদানের ঘনত্ব বেশি ও ক্ষতিকর সেগুলোকে ভারী ধাতু বলা হয়। ভারী ধাতু ও হ্যালোজেনের উদাহরণ হলো আর্সেনিক, লেড, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, ফ্লোরাইড ইত্যাদি এবং এই ভারী ধাতুর প্রকৃত আয়তন ১৬ g/m3-এর বেশি। ভারী ধাতুগুলি জৈব পচন ও সহজে ক্ষয় বা বিনষ্ট হয় না, তাই এগুলি পরিবেশে থাকে এবং এদের জৈব সঞ্চয়নের (Biomagnification) বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই ভারী ধাতু বিভিন্ন পথ দিয়ে মানবসৃষ্ট একাধিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অথবা পণ্যের মাধ্যমে জলজ বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশ করে।

এই ভারী ধাতু কেবল জলজ বাস্তুতন্ত্রের গুণমানকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, খুব কম পরিমাণে হলেও মানুষের শরীরে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। অল্প মাত্রায় এই সমস্ত ভারী ধাতুগুলি সংস্পর্শে এলে স্বাস্থ্যের উপর কোনো তাৎক্ষণিক প্রভাব নেই। কিন্তু ক্রমাগত বা বারবার শরীরে প্রবেশ করলে, ধীরে ধীরে জমা হলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। মানবদেহে এই ভারী ধাতুগুলির বিষাক্ততা ইমিউনিটি শক্তির মাত্রা হ্রাস করে, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ব্যাহত করে এবং রক্তকোষ গঠনে বাধা দেয়। ভারী ধাতুগুলি ক্রমাগত শরীরে যেতে থাকলে তবে এটি শারীরিক, স্নায়বিক এবং পেশীগুলির কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং বিভিন্ন রোগ ঘটায়, যেমন মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, পারকিনসন্স ডিজিজ, মাস্কুলার ডিস্ট্রফি এবং আলঝাইমার ইত্যাদি। কিছু ভারী ধাতু এবং তাদের যৌগগুলির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব এমনকী ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের জলশক্তি বিভাগের পরিসংখ্যান (২০১১) অনুযায়ী ২৩টি রাজ্যের প্রায় ১৩২৪ জেলায় ধাতব পদার্থের দ্বারা জল দূষণ এখনো পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার, অসম, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট এই কয়েকটি রাজ্যে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব সর্বাধিক। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশ কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্র ফ্লুরাইড বিষে আক্রান্ত। কেন্দ্রীয় জল কমিশন (২০২০)-এর রিপোর্ট অনুসারে ভারতের ৬৬৮ শহরে জল নিষিদ্ধ গুণমানের নীচে অবস্থান করে। দিল্লি, কলকাতার মতো মহানগরের আওতার বাইরে নয়। কেন্দ্রীয় পরিবেশ নিয়ন্ত্রক পর্ষদ (২০২২) তথ্যসূত্র বলছে দশটি রাজ্যে অপরিশোধিত জলের মধ্যে উচ্চ মাত্রায় সীসা, আয়রন, নিকেল, ক্যাডমিয়াম ও আর্সেনিক (সিএসই) রয়েছে যা ভূগর্ভস্থ জলকে দূষিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

বর্তমানে, পশ্চিমবঙ্গে মূলত দুটি উপাদান— আর্সেনিক ও ফ্লুরাইড জলের মধ্যে বেশি মাত্রায় পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট নয়টি জেলা (বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, হাওড়া, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)-কে আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনা সর্বাধিক ও মুর্শিদাবাদ দ্বিতীয় সর্বাধিক আর্সেনিক-আক্রান্ত জেলা এবং বাঁকুড়া হলো রাজ্যের সবচেয়ে ফ্লোরাইড-আক্রান্ত জেলাগুলির মধ্যে একটি। আর্সেনিকের সীমা বিআইএস অনুযায়ী পানীয় জলের মান হলো 0.01mg/L. তবে পশ্চিমবঙ্গ সর্বোচ্চ অনুমোদিত মানের 0.05mg/L এবং ফ্লোরাইডের পানীয় জলের সর্বোচ্চ অনুমোদিত মান 1.5mg/L।

ভূগর্ভস্থ জলের দূষণকে জিওজেনিক কর্মকাণ্ডের ফল হিসেবে মনে করা হয়। তাই আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে স্থান ও সময় উভয় ক্ষেত্রেই আর্সেনিক বা ফ্লোরাইডের বিস্তার কল্পনা করুন। যে স্থানকে আগে আর্সেনিক বা ফ্লোরাইড আক্রান্ত বলে মনে করা হতো না ভূগর্ভস্থ জলের নমুনা বিশ্লেষণ হওয়ার পর সেই স্থান আর্সেনিক বা ফ্লোরাইড আক্রান্ত স্থানের তালিকায় সংযোজিত হচ্ছে।

নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ তথা আর্সেনিক বা ফ্লোরাইড দূষণ মোকাবেলা করার জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দুই পক্ষ থেকে। প্রাথমিক দৃষ্টি প্রধানত দেওয়া হয়েছে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড মুক্ত বিকল্প পানীয় জলের ব্যবস্থা করা এবং আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ও অন্যান্য ধাতব মৌল অপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে দূষিত ভূগর্ভস্থ জলকে শুদ্ধ পানীয়জলে পরিণত করা। দূষিত পানীয় জলের সব থেকে নিরাপদ বিকল্পটি হলো ভূপৃষ্ঠ জল বা সারফেস ওয়াটারের ব্যবহার। কিন্তু এই ধরনের জল পাওয়া একটি সমস্যা। তাই এটি সর্বত্র বাস্তবায়ন করা যায় না। সেক্ষেত্রে, কম চাহিদার স্থানে বৃষ্টির জল ধরে রাখার প্রক্রিয়াকে (Rain Water Harvesting) উৎসাহ দেওয়া হয়। সর্বসাধারণের জন্য টিউবওয়েলের সঙ্গে সঙ্গে কুয়ো খনন (যেখানে সম্ভব), নদীর জলের ব্যবহার ইত্যাদি বিকল্পগুলির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

এই দিশাতে কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল পরিষদ (Central Ground Water Board) বিগত কয়েক দশক ধরে নিরন্তর কাজ করে আসছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে জলদূষণ আক্রান্ত স্থানে কমিউনিটি ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্লান্ট (Community Water Purification Plant), রিভার্স অসমোসিস প্লান্ট (RO Plant) ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করে আসছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত সরকার ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য 'জল জীবন মিশন' (JJM) প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চলেছে। এই প্রকল্পে আর্সেনিক এবং ফ্লোরাইড দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, অটল মিশন ফর রিজুভেনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন (AMRUT) প্রকল্পের অধীনে ২৫ জুন, ২০১৫ তারিখে নির্বাচিত ৫০০টি শহরে জল সরবরাহ-সহ পানীয় জল সংক্রান্ত পরিকাঠামোর উন্নয়নে নজর দেওয়া হয়েছে। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির কাছে যেখানে দুর্গম এলাকা, পার্বত্য ও উপকূলীয় শহর, যেখানে আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ইত্যাদির জন্য জলের গুণমানের সমস্যা রয়েছে সেইসব স্থানে বিশেষ জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে মোট তিন ভাগ জল থাকলেও পানীয় জলের পরিমাণ শুধুমাত্র ৩ শতাংশ, তাই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য জল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা।

একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে ভূগর্ভস্থ জল প্রচুর এবং চাহিদা অনুযায়ী টানা যায় এবং এছাড়াও কোনো দূষণ থেকে ঝুঁকি মুক্ত— এটি সম্পূর্ণ একটি ভুল ধারণা। জল একটি অমূল্য সম্পদ, একমাত্র এর যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহারই মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। □

বাঙ্গালির প্রতাপ প্রতাপাদিত্যে

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

পয়লা বৈশাখ যশোহর-নৃপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য (১৫৬১-১৬১১)-র রাজ্যাভিষেকের দিন। মহারাজের স্মৃতিকে যদি তুলে ধরা যায়, তবে আত্মপ্রকাশ করবে আগ্রাসী মুঘলদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালির স্বাধীন স্বরাজের আর এক আদর্শ স্থাপনের গল্প। যে রাজ্যের সীমানা ছিল ধূমঘাট থেকে পাটনা; পুরী থেকে চট্টগ্রামের সন্দীপ। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজেরও আগে (১৬৩০-১৬৮০) বঙ্গভূমি পথ দেখিয়েছিল মুঘলদের বিরুদ্ধে বীরত্বের প্রদর্শনে। চিরপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালির দৌর্বল্যের যে অধুনাতন কাহিনি শোনা যায়, তার বিপ্রতীপে দুর্লভ শক্তিপূজারিরাও যে বঙ্গভূমে বসবাস করতেন, তা মনে করিয়ে দেবার দায় দেশবিরোধীদের না থাকতে পারে, দেশব্রতীদের আছে। রবীন্দ্র-ভাগ্নী সরলাদেবী চৌধুরানি (১৮৭২-১৯৪৫)-র 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' এমনই এক জাতীয় জীবনের ইতিহাসের ভাব-আরাধনার প্রয়াস, যে ইতিহাস ঠিক মতো ধরা হয়নি। তারই অঙ্গ ছিল লাঠিখেলা ও অস্ত্রপূজন। ১৯০৩ সালে সরলা দেবী চৌধুরানি বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রচলন করলেন প্রতাপাদিত্য উৎসব। আর এই বছরই প্রকাশিত হলো নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটক 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য'। নাট্যকার সেখানে দেখালেন, বাঙ্গালি না পারে, এমন কাজই নেই। এখন কে সেই প্রতাপ? কবি ভারতচন্দ্র লিখছেন,

'যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
যোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।'

১৮৯৫ সালে বালগঙ্গাধর তিলক দেশবাসীকে ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলতে প্রচলন করেছিলেন 'শিবাজী উৎসব'। মারাঠি এই উৎসব বঙ্গপ্রদেশে প্রভাব বিস্তার করলো। সরলা দেবী বঙ্গের বীর সিরিজের ক্ষুদ্র পুস্তিকা-সম্ভার রচনা করলেন এবং বীররসে বাঙ্গালি যুবসমাজকে জারিত করে দিলেন। তারই অনুষঙ্গে প্রতাপাদিত্যর পুত্র উদয়াদিত্যের বীরত্বকেও স্মরণ করে আয়োজিত হলো 'উদয়াদিত্য উৎসব'। মঞ্চে বৃহৎ তরবারি রেখে পুষ্প অর্পণ করে বীরপুজো সম্পন্ন করলো স্বাধীনতাকামী যুবসমাজ।

সরলাদেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী তথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা। তিনি বঙ্গের যুবমণ্ডলীকে জাগিয়ে তুলতে এবং তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালতে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'-এর সূচনা করলেন। প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকের দিন ছিল পয়লা বৈশাখ। ওই দিনটিকেই বেছে নেওয়া হলো বর্ষবরণ এবং অস্ত্রগ্রহণের দিন হিসেবে। কলকাতার ভবানীপুরে মণিলাল গাঙ্গুলির আমন্ত্রণে সরলাদেবীর অংশগ্রহণের শর্ত হিসেবে সাধারণ সাহিত্য সমিতির বার্ষিক উৎসব আয়োজনের দিনটি ফেলা হলো পয়লা বৈশাখ। অতএব উৎসবে সভানেত্রী হতে রাজিও হয়ে গেলেন সরলাদেবী। উৎসবের তারিখটি এরপর এই দিনেই চালু হয়ে গেল। বাঙ্গালির বীরপূজার উৎসব, ব্রিটিশ শক্তিকে সরানোর অন্তরঙ্গে শক্তিপূজার প্রচলন, যেমনভাবে শিবাজী উৎসব চালু করে শক্তিশালী হয়েছিল মরাঠিরা, তেমনই বঙ্গদেশেও শুরু হলো।

Young India পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) এই উৎসবের আয়োজনকে প্রশংসা করে লিখলেন, 'As necessity is the mother of invention, Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal.'

উৎসবে বক্তৃতার ক্লান্তিকর কর্মসূচি ছিল না। বরং ছিল বীরত্বের খেলার প্রদর্শনী দেখে অন্তরে-বাহিরে শক্তিশালী হবার প্রেরণা। কেবলমাত্র একটি প্রবন্ধ পাঠের আয়োজন ছিল, সেটি হচ্ছে প্রতাপাদিত্যের জীবনী। আর ছিল অস্ত্রপূজার শপথ এবং সেরা বাঙ্গালি কুস্তিগিরের প্রদর্শন, তলোয়ারধারীর কেরামতি, বক্সিং আর লাঠি খেলোয়াড়দের নানান প্যাঁচ-পয়জার। প্রতাপাদিত্য উৎসব সেই সময় সারা বঙ্গে যুবমনে দারুণ আলোড়ন ফেললো। এর মধ্যে ১৯০৫ সালে ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গ করে বাঙ্গালির একতাকে ভেঙে দেবার চেষ্টা করলো, বিপ্লবের পটভূমিকায় দেশাত্মবোধক শক্তির আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো।

আজ কি প্রতাপাদিত্যকে বাঙ্গালি মনে রেখেছে? মহারাজ শশাঙ্ককেও মনে রেখেছে? বাঙ্গালিকে যদি মহাকার্যে শেষরক্ষা বলে কিছু করতে হয়, চরিত্রগত দুর্বলতায় সবকিছু যাতে পণ্ড হয়ে না যায়, তার জন্য বীররসের সাধনা খুবই দরকার। সেরা বাঙ্গালির যোদ্ধ রূপের সাধনা এই কারণেই। যোদ্ধা হওয়া এবং যোদ্ধার উপাসনা করা। □

ফকিরি অত্যাচারের প্রতিরোধে ভারতের নাগা সন্ন্যাসীরা

উত্তম মণ্ডল

মুঘল বাদশা আকবরের সময়কাল পর্যন্ত 'রাজার জাত' মুসলমান ফকিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল হিন্দু সাধু সন্ন্যাসী থেকে সাধারণ মানুষ। বারাণসীতে সাধুসন্ন্যাসী বা সাধারণ মানুষ কেউই বিকেলের দিকে মন্দিরে যেতে সাহস করতো না। কারণ, এর অনিবার্য পরিণাম ছিল মৃত্যু। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের রক্তে লাল হয়ে যেতো বারাণসীর গঙ্গা। এ অবস্থায় হিন্দুদের রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন কোটালীপাড়ার ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী

সম্প্রদায়ের মধুসূদন সরস্বতী। তিনি দেশীয় হিন্দু রাজাদের সৈন্যদলকে গেরুয়া পোশাক পরিয়ে গঠন করলেন নাগা সন্ন্যাসী দল (Knight Templers)। এরপর থেকেই ধর্মান্ধ মুসলমান গাজিদের একতরফা আক্রমণ থেমে যায় এই নাগা বাহিনীর হাতে। (বাংলার ইতিহাস : ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৪৭)।

'নগ' মানে পর্বত। নাগা সন্ন্যাসীরা দেবাদিদেব শিবের উপাসক। পুরুষের পাশাপাশি মহিলা নাগা সন্ন্যাসিনীরাও আমাদের দেশে সাধন-ভজনের পাশাপাশি ধর্মরক্ষার দায়িত্বেও রয়েছেন। ভারতের অযোধ্যা, জয়পুর, গোয়ালিয়র-সহ বিভিন্ন দেশীয় সৈন্যদলে ছিল নাগাবাহিনী। এদেশে 'শাহ' পদবিধারী ফকিররা ছিল বেশি বিপজ্জনক। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে এদের বেশি যাতায়াত ছিল। বিক্ষুব্ধ জনতার ভেতর থেকেও লোকজন নিয়ে এরা নিজেদের দল ভারী করতো এবং এ থেকেই বঙ্গে চালু হয়ে যায় বহুল প্রচলিত 'ছেলেধরা' প্রবাদটি। এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে মজনু শাহ। ভারতের তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে এই ফকিরদের বহুবার যুদ্ধ হয়েছে।

মজনু শাহ'র নেতৃত্বে ফকিররা পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলায় নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। এ বিষয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন রায় সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ তাঁর লেখা 'সন্ন্যাসী অ্যান্ড ফকির রাইডার ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে। তিনি জানাচ্ছেন, সম্ভ্রম রক্ষার জন্য একটি মেয়ে এক নৃশংস অত্যাচারী ফকিরকে বাবা বলে সম্বোধন করেও রেহাই পায়নি। তাকে বলাৎকার করা হয়েছিল।

এরপর ঘটনার মোড় ঘুরে যায়। বগুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার অনুসারে, ফকির মজনু শাহ যখন বগুড়ায় রয়েছে, এমন সময় হঠাৎই ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে একদল দুর্ধর্ষ নাগা সন্ন্যাসী এসে মজনু শাহর দলকে আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। মজনু শাহ'র মৃত্যু হয়। কেবলমাত্র বেঁচে থাকে তাঁর শিশুপুত্র। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক পানিক্কর জানাচ্ছেন, হিন্দুদের ওপর ফকিরদের অত্যাচার দমন করতেই মধুসূদন সরস্বতীর তৈরি নাগা সন্ন্যাসীর দল বঙ্গপ্রদেশে গিয়েছিলেন।

—A Survey of Indian History : K.M. Pannikar.

ফার্সি ভাষায় লেখা 'দাবীস্থান' গ্রন্থের তথ্য থেকে জানা যায়, এই সন্ন্যাসীরা সদাসর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। বিধর্মীদের আক্রমণ প্রতিরোধে বার বার ঝলসে উঠেছে নাগা কম্যান্ডো বাহিনীর হাতের ত্রিশূল ও তরবারি। এর আরও একটি বড়ো উদাহরণ আফগান আক্রমণকারী আহম্মদ শাহ আবদালির গোকুল আক্রমণ প্রতিরোধ। গোকুল মন্দিরের বিগ্রহ রক্ষার্থে প্রায় ২০০০ নাগা সন্ন্যাসী জীবন বিসর্জন দিয়ে এ দেশে এক উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। রক্তলোলুপতার পাশাপাশি অর্থপিশাচ আহম্মদ শাহ আবদালি দুরানির নজর পড়েছিল বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের বসবাসক্ষেত্র গোকুলের দিকে। খবর ছিল, সেখানে রয়েছে প্রচুর ধনসম্পদ। সেই সম্পদের লোভে আবদালি এক বিশাল বাহিনী পাঠায় গোকুলে। কিন্তু চার হাজার নাগা সন্ন্যাসী রুখে দাঁড়ায় তাদের সামনে। দু'দলে চলে চার ঘণ্টা ধরে ভীষণ যুদ্ধ। গোকুলনাথকে রক্ষা করতে দু'হাজার নাগা সন্ন্যাসী জীবন বিসর্জন দিলেন, পাশাপাশি নিহত হলো দু' হাজার আবদালি বাহিনীর সৈন্যও। শেষে বঙ্গের সুবেদারের দূত যুগলকিশোরের অনুরোধে বন্ধ হয় এই ভয়ংকর যুদ্ধ। ফিরে যায় আফগান বাহিনী। তা না হলে আরও রক্ত ঝরতো সেদিন গোকুলের মাটিতে।

তথ্যসূত্র :

১. বাংলায় ইতিহাস : ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, ২০২০।

২. Fall of the Mughal Empire. Vol. II, P-86-87 : J.N. Sorkar।

কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কর্তা চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

দীপক খাঁ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কালাজ্বর রোগটি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মহামারি রূপে দেখা দিত। এই রোগটি বেলেমাছি দ্বারা ছড়িয়ে পড়তো। সে সময় কোনো ওষুধ না থাকায় এই রোগের পরিণতি হতো মৃত্যু। প্রসঙ্গত, মা সারদা, কবি সুকুমার রায়ের এই রোগে মৃত্যু ঘটে। এই রোগের ওষুধ আবিষ্কর করে স্মরণীয় হয়ে আছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী বাঙ্গালি ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

১৮৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসে বিহারের মুঙ্গের জেলার জামালপুরে তাঁর বিজ্ঞানীর জন্ম। বাবা নীলময় ব্রহ্মচারী রেলওয়ে বিভাগের ডাক্তার ছিলেন। জামালপুর রয়েজ স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা ও পরে এফএ পাশ করেন। ১৮৯৩ সালে হুগলি কলেজ থেকে বিএ উত্তীর্ণ হন। বি.এ. পরীক্ষার পর একই সঙ্গে কেমেস্ট্রি ও ডাক্তারি পড়া শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে কেমেস্ট্রিতে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ পাশ করেন ১৮৯৮ সালে এম.বি পাশ করেন। মেডিসিন ও সার্জারিতে প্রথম স্থান পেয়ে গুড ইভ ও ম্যাকলিয়ড পদক পান। এরপর ১৯০২ সালে মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। রক্তের লোহিত কণিকার উপর গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। প্রথমে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের প্যাথলজি ও মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক হিসাবে কাজে যোগ দেন। ১৯০৫ সালে কলকাতায় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মেডিসিনের শিক্ষক পদে যোগ দেন।

ওই সময় বহু কালাজ্বরের রোগী আসত। কিন্তু কোনো ওষুধ না থাকায় রোগীরা মৃত্যুমুখে পতিত হতো। উপেন্দ্রনাথ কালাজ্বরের ফলপ্রদ ওষুধ আবিষ্কারের কাজে হাত দিলেন। এই জন্য তাঁর কেমিস্ট্রির জ্ঞান অনেকটাই সাহায্য করলো। তিনি অ্যান্টিমনির সঙ্গে ইউরিয়া দিয়ে তৈরি করলেন 'ইউরিয়া স্টিবামাইন'। এই ওষুধ প্রয়োগ করে তিনি কালাজ্বরের রোগে সুফল পেলেন। মানব কল্যাণে জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কারের জন্য উপেন্দ্রনাথের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন (১৯৩৪)।

উপেন্দ্রনাথ প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষে পথম এবং পৃথিবীতে হয় 'ব্লাড ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতাতেই। ১৯২৪ সালে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে নিজ বাড়িতেই উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে ওষুধ তৈরির গবেষণা ও কারখানা গড়ে তোলেন। এখানে ইউরিয়া স্টিবামাইন-এর সঙ্গে সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ তৈরি হতো। দুঃখের বিষয় এই প্রতিষ্ঠান ১৯৬৩ সালে বন্ধ হয়ে যায়— নিজ ছেলেদের অকর্মণ্যতর কারণে।

বিদেশি বিজ্ঞানীদের উক্তি— 'Treatise on Kalaqzar' is a fremier work on the subject ব্রিটিশ সরকার বলেছিল— ' হাজার হাজার মানুষের জীবনকে উপেন্দ্রনাথের গবেষণা বাঁচিয়ে ছিল।'

উপেন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতার একটি অংশ এইরূপ— 'শিয়ালদহের ক্যাম্পবেল হাসপাতালের সেই স্মরণীয় রাত্রি আমি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি যেখানে একদিন কঠিন পরিশ্রমের পর রাত্রি ১০ টার সময় ধোঁয়ায় ভরা ঘরে, টিমটিম করা জ্বলা লণ্ঠনের আলোয় আমি দেখলাম আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয়েছে। কিন্তু তখন জ্ঞানতাম না ঈশ্বর আমার দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচাবে। গ্যাসের বা জলের সংযোগবিহীন সেই ঘরে মাসের পর মাস রাতের অন্ধকারে পুরানো কেরোসিনের আলোয় আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আমার কাছে এই ঘর তীর্থক্ষেত্র হয়ে থাকবে চিরকাল।'

পৈতৃক বাসভূমি পূর্বস্থলীতে তিনি বাবার নামে একটি স্কুল তৈরি করেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'পূর্বস্থলী নীলময় ব্রহ্মচারী ইনস্টিটিউশন'। ১৯৩৬ সালে উপেন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ান সায়েন্সে কংগ্রেসে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভের জন্য উপেন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ বিদেশ যাননি— সুপারিশ জানাননি। প্রচারবিমুখ এই ডাক্তার বিজ্ঞানীর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আগেই ১৯৪৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জীবনাবসান হয়। □

ভক্তদের কর্মফল হরণ করেন ফলহারিণী মা কালী

প্রদীপ মারিক

সৃষ্টির রক্ষার্থে আমরা তাঁরই দ্বারস্থ। শয়নে স্বপনে তাঁর নাম স্মরণ করলে সব বাধা দূর হয়ে যায়। তিনি আছেন অন্তরের অন্তরাত্মায়। তাঁকে ডাকলেই সব বাধা দূর হয়ে যায়, এতটাই প্রবল বিশ্বাস আছে আমাদের। সেই জগজ্জননীর কল্যাণে আমরা দিশাহীন হয়েও সঠিক পথে ফিরে আসি। সেই শিব-জায়া মা শিবানীকে নানা রূপে আমরা পুজো করে আসছি। কালীসাধকের ভাবনা অনুসারে রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, রটন্তীকালী, ভদ্রকালী, দক্ষিণাকালী এইরকম নানা নামে পূজিত হয়।

সংসার জীবনে আমরা নানা সমস্যা, উদ্বেগ, হতাশায় ভুগি। তাই ফলহারিণী কালীপুজোর দিন মাকে স্মরণ করলেই সব বাধা দূর হয়ে যায়। মহামারী অনাবৃষ্টি বা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে আমরা রক্ষাকালীপূজা করি, কার্তিক মাসে দক্ষিণা কালীপুজোয় সর্বজীবের সার্বিক কল্যাণ হয় আর ফলরারিণী কালীপূজা করলে বিদ্যা, কর্ম ও অর্থভাগ্যের উন্নতি ঘটে। দাম্পত্য জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, প্রেম, ভালোবাসা, সর্বোপরি গৃহশান্তির জন্য ফলহারিণী কালীপূজা খুব প্রয়োজনীয়।

জীবনের পথ চলতে চলতে আমরা পাপ-পুণ্যের কর্মফলেই আবির্তিত হই। সুখ থাকলেই তার পরেই দুঃখ ধেয়ে আসে। কিন্তু দুঃখের সময় অবিচল থেকে ঈশ্বরের নাম গান করতে হয়। মা ফলহারিণীকে স্মরণ করলে আমাদের সব মন্দ ভাব দূর হয় এবং দুঃখ সরিয়ে আবার আমরা সুখের মুখ দেখি। আমরা সারা জীবন বিভিন্ন কর্ম করে যাই কিন্তু কর্মসমূহের ফলদান করেন দেবী কালিকা। তিনিই যে শক্তির উৎস, তিনিই জ্ঞান এবং কর্মশক্তি রূপে বিরাজিত। মা কালী জীবের কর্মফল অনুসারে ফল প্রদান করেন। তিনি নিজের মধ্যে সমস্ত কর্মফলকে ধারণ করেন। তিনিই আমাদের কর্মফল হরণ করেন, তিনিই

আবার মুক্তি প্রদান করেন, তিনিই ফলহারিণী কালী।

হিন্দু শাস্ত্রে চতুর্বর্গের উল্লেখ আছে। এই চারটি অপার্থিব ফল হলো ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কল্পতরুর কাছে আমরা যা চাইবো সেটাই আমরা পাবো। কিন্তু আমাদের তো ভেবে চিন্তে চাইতে হবে না হলে যে হিতে বিপরীত হবে। এক ক্লান্ত পথিক কল্পতরু মূলে বসে তৃষ্ণার জল চাইলো। সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে জল এলো। একে একে বিভিন্ন খাবার চাইলো, সেটাও এলো। এরপর ভাবলো যদি এই সময় বাঘ আসে তাকে তো মেরে ফেলবে যেমন চাওয়া তেমন ফল, সে মারা গেল। সুতরাং বুঝে চাইতে হবে। একদিন ঝড়ে রামপ্রসাদের ঘরের চারপাশের বেড়া ভেঙে যায়। রামপ্রসাদ আর তার মেয়ে বেড়া বাঁধতে যায়।

কিন্তু একটু পরে মেয়ে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে খেলার মাঠে চলে যায়। রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধতে লাগেন আর মায়ের গান করতে থাকেন। খেলা শেষ করে মেয়ে ফিরে এসে দেখে বাবার বেড়া বাঁধা শেষ হয়েছে। বাবাকে মেয়ে প্রশ্ন কলো, বাবা এত কম সময়ে তুমি কী করে বেড়া বাঁধলে? বাবা বললো, কেন তুই তো ছিলি। মেয়ে বললো, আমি তো ছিলাম না, বন্ধুদের সঙ্গে তো খেলছিলাম। রামপ্রসাদ বুঝলেন এই বেড়া বাঁধার জন্য মা-কালী তার মেয়ের রূপ ধরে তাকে সাহায্য করলেন। রামপ্রসাদ বেড়া নিয়ে গান রচনা করলেন। চোখের জলে মা কালীর জন্য একটার পর একটা গান রচনা করলেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'আদানাং হি বিসর্গায় সত্যাং বারিমুচাদিব' অর্থাৎ এক ষষ্ঠাংশ দেওয়ার পরিবর্তে সহস্রগুণে ফিরিয়ে দেন তিনি। যেমন সূর্য জলাধার থেকে জল নিয়ে মেঘ সৃষ্টি করে বৃষ্টি হয়ে সহস্র গুণে ফিরিয়ে দেয়। আমরা তো নিতে জানি, দিলাম কোথায়?

তাই মা আমাদের সব কর্মফল হরণ করে সহস্র গুণ ফিরিয়ে দেন। আমাদের তো কিছু পেতে গেলে কিছু তো দিতেই হবে। এই দেওয়াটা সমাজের প্রতি, গরিব, দুঃখীর প্রতি দেশের প্রতি। কালকে প্রকাশ করতে গেলে কালীরূপ পাওয়া যায়। ইনি মহামায়া, চৈতন্যস্বরূপা, অসুরদলনী, পাপ-ধ্বংসকারিণী। সৃষ্টিতে মহাকালী, স্থিতিতে মহালক্ষ্মী প্রলয়ে মহাসরস্বতী। এই কালী শিব মহিষী। শিব আর শক্তিতে কোনো তফাত নেই। বীজের মধ্যে যেমন উদ্ভিদ সত্তা থাকে তেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকে মহাকালরূপ। তাই যে সব ভক্ত জীবনের বৈচিত্র চান তারাই কালীর আরাধনা করে থাকেন। গভীর অমানিশার যখন কালো একেবারে ঘনিয়ে আসে, নিথর সুচিভেদ্য কালো অন্ধকার তখনই কেবলমাত্র নিত্যকলা থাকে সেই অবস্থায় শিব ও শক্তির সামঞ্জস্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এই দিনেই মা সারদাকে পূজা করেছিলেন। মাতৃআরাধনার জন্য তিনি এই তিথিকেই বেছে নেন। □

ট্রান্সফ্যাট জারিত খাদ্যদ্রব্যের কুফল

হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসে অক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা

অধ্যাপক ড. সমর সরকার

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হতে প্রকাশিত একটিস্ট্যাটাস রিপোর্ট (২৩ জানুয়ারি, ২০২৩) অনুযায়ী বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৫০০ কোটি মানুষ ট্রান্সফ্যাট বা ট্রান্সফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষতিকর প্রভাবের সম্মুখীন যা হৃদরোগ ও মৃত্যুর ঝুঁকি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে।

ট্রান্সফ্যাট কী ?

ট্রান্সফ্যাট বা ট্রান্সফ্যাটি অ্যাসিড প্রাকৃতিক অথবা শিল্পজাত। ট্রান্সফ্যাট এক প্রকার খাদ্যতালিকাগত স্নেহপদার্থ বা dietary fat। সব রকমের ফ্যাট বা স্নেহপদার্থের মধ্যে ট্রান্সফ্যাট হলো স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হানিকর। খাদ্যতালিকায় অধিক পরিমাণে ট্রান্সফ্যাটের উপস্থিতি হৃদরোগ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। তেল তার তরল অবস্থা (liquid oil) হতে কঠিন অবস্থায় (solid fats.) পরিণত হলে তা ট্রান্সফ্যাটে পর্যবসিত হয় (উদা: মার্জারিন ও শর্টেনিং)। অধিকাংশ ট্রান্সফ্যাট যা আমরা খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকি, তা উদ্ভিজ্জ তেলের সাথে হাইড্রোজেন যোগ করে তরল অবস্থার তেলকে ঘরোয়া তাপমাত্রায় কঠিন ফ্যাটে পরিণত করার উৎপাদন প্রক্রিয়াজাত। এই পদ্ধতির নাম 'হাইড্রোজেনেশন'। 'cis' ও 'trans' – এই পরিভাষাদ্বয়ের মাধ্যমে ফ্যাটের অণুর অন্তর্গত কার্বন পরমাণুর মধ্যে যেখানে দ্বিসমযোজীবন্ধন (double bond) উপস্থিত, সেই স্থলের কার্বন পরমাণুদ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত হাইড্রোজেনপরমাণুদ্বয়ের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। 'cis' ও 'trans' হলো একই অণুর জ্যামিতিক বা গাঠনিক আইসোমার। cis ফ্যাটি অ্যাসিড্রে ক্ষেত্রে এই হাইড্রোজেন পরমাণুদ্বয়ের অবস্থান থাকে কার্বন শৃঙ্খলের একই পাশে। trans ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এই হাইড্রোজেন পরমাণুদ্বয় কার্বন শৃঙ্খলের বিপরীত পাশে থাকে। ট্রান্সফ্যাটি অ্যাসিড বা TFA বা trans-unsaturated ফ্যাটি অ্যাসিড বা ট্রান্সফ্যাট সমূহ হলো অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সম্পন্ন লিপিড বা স্নেহপদার্থের এক উপশ্রেণী, যা trans (ট্রান্স) আণবিক অবয়বে (trans-configuration) অন্তত একটি দ্বিসমযোজীবন্ধনযুক্ত। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড্রে তুলনায় সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর। কিন্তু হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিজ্জ তেলে আণবিক হাইড্রোজেন যোগ করে ওই তেলের মধ্যে উপস্থিত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড যে আণবিক অবয়ব পরিগ্রহ করে (বা trans configuration-এ পর্যবসিত হয়) তা সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর। স্নেহপদার্থ বা ফ্যাটের অন্তর্গত একটি কার্বন শৃঙ্খলের নির্দিষ্ট স্থানে দুটি কার্বন পরমাণু এক বা একাধিক দ্বিসমযোজীবন্ধনে আবদ্ধ থাকলে সেই ফ্যাটের অণু হলো অসম্পৃক্ত বা unsaturated ফ্যাট। এই অসম্পৃক্ত ফ্যাট এক বা একাধিক দ্বিসমযোজী বন্ধন আধারিত কার্বন শৃঙ্খলের যে বিন্যাস তার ভিত্তিতে 'cis' ও 'trans' এই দুটি রূপে বিভক্ত। জোড় সংখ্যায় বিদ্যমান কার্বন পরমাণু সমুহের দ্বারা গঠিত সরলরৈখিক কার্বনশৃঙ্খল সম্পন্ন জৈব অ্যাসিড হলো সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বা saturated fatty acid, যার ক্ষেত্রে কার্বন পরমাণুগুলির মধ্যে কোনো দ্বিসমযোজী বন্ধন (double bond) অনুপস্থিত। কিন্তু অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড্রে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফ্যাটি অ্যাসিডশৃঙ্খলে অন্ততপক্ষে একটি দ্বিসমযোজী বন্ধনের উপস্থিতি আবশ্যক। প্রাণিজ উৎসোদ্ভূত সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডসমূহ ঘরোয়া তাপমাত্রায় কঠিন (solid) অবস্থা ধারণ করে। উদ্ভিজ্জ উৎসোদ্ভূত অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সমূহ তরল অবস্থায় থাকে এবং ক্ষতিকর নয়। কিন্তু উদ্ভিজ্জ তেল হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডে বা হাইড্রোজেনেটেড তেলে রূপান্তরিত হলে সেই ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড ক্ষতিকর ও অস্বাস্থ্যকর। খাদ্যসামগ্রীতে এই ট্রান্স ফ্যাটের প্রাচুর্যের প্রভাব সংক্রান্ত সমস্যাটি মনুষ্যসৃষ্ট বা man-made এবং এহেন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতটি ব্যবসায়িক এবং সেই শিল্পজাত খাদ্যদ্রব্যকে সুস্বাদু, মুচমুচে এবং খাদ্যরসিকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলাই হলো এই ব্যবসায়িক লক্ষ্য। সমাজের একটা বড়ো অংশে বিশেষত কমবয়সিদের এই ফাস্টফুডের প্রতি আসক্তি একটি ক্রমবর্ধমান বিপজ্জনক প্রবণতা যা বহু ক্ষেত্রে হৃদরোগজনিত মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা ফাস্টফুডের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার দরুন তাদেরও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ট্রান্সফ্যাট কীভাবে ক্ষতি করে ?

হৃদরোগ, স্ট্রোক ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ডাক্তারবাবুরাও এই অতিরিক্ত ট্রান্সফ্যাট সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধিতেও এই ট্রান্স ফ্যাটের ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

খাদ্যে ট্রান্স ফ্যাটের উপস্থিতি:

'আংশিকভাবে হাইড্রোজেনেটেড তেল' হলো ট্রান্স ফ্যাটের উৎপাদিত রূপ (manufactured form) যা নিম্নলিখিত খাদ্য দ্রব্যে থেকে যায় :

১) বাণিজ্যিক খাদ্যপণ্য - বেকারিজাত সেঁকা খাবার। উদা: কেক, কুকিজ (cookies), পাইজ (pies)।

২) মাইক্রোওয়েভড্ পপকর্ন।

৩) রেফ্রিজারেটেড পণ্য: হিমায়িত পিজ্জা

৪) ময়দা দিয়ে তৈরি পণ্য - উদা: বিস্কুট, রোল, চাউমিন

৫) নানারকম ভাজাভুজি, উদা: french fry, ডোনাট (doughnut) ও ফ্রায়েড চিকেন ।

৬) অদুগ্ধজাত (non-dairy) কফি ক্রিমার।

৭) স্টিক মার্জারিন।

৮) পনির ও ঘি ।

৯) টোস্ট বিস্কুট (rusk), ফ্রায়েড খাবার, পুরি, কচুরি, পকোড়া, ভুজিয়া, নিমকি, সিঙ্গারা।

১০) স্ন্যাকস্ জাতীয় খাবার।

১১) প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য (processed food) ।

১২) পেস্ট্রি ।

ময়দায় কি ট্রান্সফ্যাট বিদ্যমান ?

পরিস্রুত খাদ্যশস্যজাত (refined grains) পণ্য ময়দা দিয়ে তৈরি বিভিন্ন প্যাকেটজাত খাদ্য যেমন— আলুর চিপস্, ওয়েফার এবং বেকারিজাত পণ্যে ফাইবার বা খাদ্যআঁশের পরিমাণ কম ও উক্ত খাদ্যদ্রব্য ট্রান্স ফ্যাটে পরিপূর্ণ। এর সঙ্গে রান্নার কাজে পুনর্ব্যবহৃত ভোজ্য তেলের প্রয়োগ ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

ফাস্টফুড ও রেস্টুরেন্টের খাবারের ভূমিকা:

উদ্ভিজ্জ শর্টেনিং (ঘরোয়া তাপমাত্রায় যা এক আধা কঠিন / semi solid ফ্যাট) এবং মার্জারিনে (মাখনের মতো একটি খাদ্য পণ্য যা পুরোপুরি নিরাপদ নয়, কারণ reformulate করে কমিয়ে না আনলে এতে ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে যা অননুমোদিত) ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ উচ্চ এবং এই শর্টেনিং ও মার্জারিন ভোজ্য তেল হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ফাস্টফুড ও রেস্টুরেন্টের খাবারে (ফ্রায়েড পাইজ, french fry, চিকেন নাগেটস্, হ্যামবার্গার, ফিশফ্রাই ইত্যাদি) ট্রান্স ফ্যাটের উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত বেশি। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি নামি ফাস্টফুড প্রস্তুতকারক সংস্থার বিপণীসমূহে ব্যবহৃত তেল ২৩-২৪ শতাংশ ট্রান্স ফ্যাট সমৃদ্ধ, যেখানে ইওরোপের কিছু দেশে একই সংস্থার দ্বারা পরিচালিত বিপণীসমূহে ব্যবহৃত ভোজ্য তেলে ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ ১০ শতাংশ। ভারতে প্রস্তুত. ফাস্টফুড সমূহে উপস্থিত ট্রান্স ফ্যাটের গড় পরিমাণ উদ্বেগজনকভাবে ১৯ শতাংশেরও বেশি, যা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় হৃদরোগজনিত মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

পাঁঠার মাংসে উপস্থিত ফ্যাটের প্রকৃতি : সাধারণত স্কিনলেস চিকেন, মাছ ও উদ্ভিজ্জ উৎসগুলি অপেক্ষা পাঁঠার মাংস বা রেড মিটে সম্পৃক্ত স্নেহপদার্থ বা saturated ফ্যাটের পরিমাণ বেশি, যে saturated ফ্যাট রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে। সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটের মধ্যে সম্পৃক্ত ফ্যাট তুলনামূলকভাবে বেশি ক্ষতিকর। সম্পৃক্ত ফ্যাট ও ট্রান্স ফ্যাটের মধ্যে ট্রান্স ফ্যাট বেশি ক্ষতিকর।

কোলেস্টেরল প্রধানতঃ ২ প্রকার :

(১) Low - density Lipoprotein (LDL কোলেস্টেরল) : এটি 'খারাপ / bad কোলেস্টেরল' যা ধমনী প্রাচীরে সঞ্চিত হয়, ধমনীকে করে তোলে শক্ত ও ধমনীর অভ্যন্তরভাগ হয়ে পড়ে সঙ্কীর্ণ।

(২) High-density Lipoprotein (HDL কোলেস্টেরল) : এটি 'ভালো / good কোলেস্টেরল' যা অতিরিক্ত কোলেস্টেরল যকৃতে পাঠিয়ে শরীরে অতিরিক্ত কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস করে।

ট্রান্স ফ্যাট রক্তে LDL বা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং এই কারণে হৃদরোগ বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ট্রান্স ফ্যাট পূর্ণ খাদ্যদ্রব্যের এই দুই প্রকার ক্ষতিকর প্রভাব আছে।

ট্রান্স ফ্যাট সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য এবং কীভাবে এই ফ্যাট এড়ানো যায় : হৃদরোগের আশঙ্কা বৃদ্ধিকারী এই ট্রান্সফ্যাট সমৃদ্ধ খাদ্যতালিকা তরুণ প্রজন্ম থেকে মধ্যবয়সী এবং প্রবীণ মানুষজন-সবার ক্ষেত্রেই silent killer-এর ভূমিকা নিয়ে থাকে। ট্রান্সফ্যাট গ্রহণের প্রবণতা বাড়লে হৃদরোগ এবং রক্তবাহী নালী সম্পর্কিত ব্যধির আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়। ট্রান্স ফ্যাট অস্বাস্থ্যকর হওয়ার কারণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের FDA (Food and Drug Administration) সংস্থা খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতকারকদের তাদের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য ও পানীয়ে কৃত্রিম ট্রান্স ফ্যাট যোগ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বহু শহরে ও নানা দেশে ট্রান্সফ্যাটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ হয়েছে। ব্রাজিল ও কানাডাতেও খাদ্যে ট্রান্সফ্যাটের প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। FDA আশা করছে যে এই পদক্ষেপ প্রতি বছর অগণিত হৃদরোগ ও মৃত্যুর সম্ভাবনাকে রোধ করবে। এই বিধি জারির পরেও কিছু খাদ্যপণ্যে অতিরিক্ত ট্রান্সফ্যাটের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ট্রান্স ফ্যাটিঅ্যাসিডের ভূমিকা : গবেষণায় প্রমাণিত যে ট্রান্সফ্যাট গ্রহণের সঙ্গে টাইপ - ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কযুক্ত। ট্রান্সফ্যাটি অ্যাসিডের প্রভাবে প্রদাহ (inflammation) এন্ডোথেলিয়াল কোষসমূহের ক্রটি পূর্ণ ক্রিয়া এবং এর ফলশ্রুতিতে ক্রনিক হৃদরোগের (chronic heart disease) প্রকোপ গত এক দশক যাবৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইণ্টারলিউকিন 6, C

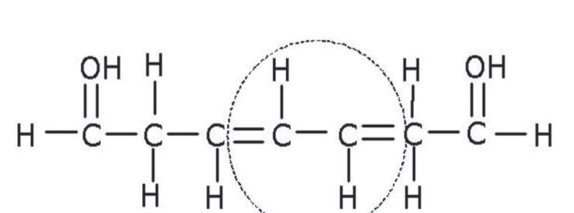

"Trans" fatty acid

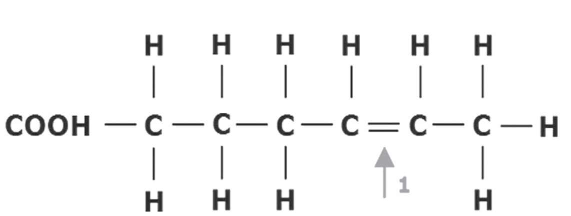

Monounsaturated Fat

রিয়্যাকটিভ প্রোটিন এবং টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর (TNF) সিস্টেমের বর্ধিত ক্রিয়া এই প্রদাহের (inflammation) marker বা পরিচায়ক। শুধু মাত্র ক্রনিক হৃদরোগের (CHD) ক্ষেত্রে নয়, এই প্রদাহের উপস্থিতিinsulin resistance, ডায়াবেটিস, dyslipidemia এবং heart failure-এর ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ঝুঁকির কারণ বা independent risk factor। ট্রান্সফ্যাটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা এন্ডোথেলিয়াল তন্ত্রের ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়া (endothelial dysfunction) সৃষ্টি করে এবং সমস্ত শরীরে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ট্রান্সফ্যাটি অ্যাসিড জারিত খাদ্যগ্রহণের অন্যতম ফলশ্রুতি স্থূলতা বা obesity।

খাদ্যপণ্যের ওপরে থাকা লেবেল : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একবার পরিবেশিত কোনো খাবারে ০.৫ গ্রাম ট্রান্সফ্যাট থাকলে সেই খাদ্যের লেবেলটিতে ০ গ্রাম ট্রান্সফ্যাটের উপস্থিতির উল্লেখ থাকে। FDA কর্তৃক উক্ত ban বা নিষেধাজ্ঞা জারীর আগে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপাদানের তালিকায় আংশিকভাবে হাইড্রোজেনেটেড উদ্ভিজ্জ তেলের উপস্থিতির উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যদি উল্লেখ থাকে তবে লেবেলে ০.৫ গ্রাম লেখা থাকলেও তা সংশ্লিষ্ট খাদ্য দ্রব্যে ট্রান্সফ্যাটের উপস্থিতির পরিচায়ক । ০.৫ গ্রাম ট্রান্স ফ্যাটের লেবেল সমন্বিত একাধিক খাবার একাধিকবার গ্রহণ করলে এইভাবে লুক্কায়িত ট্রান্স ফ্যাট সমূহ গ্রহণের মাত্রাও বাড়ে।

কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে ?

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ট্রান্স ফ্যাট গ্রহণ যত কম হয় ততই ভালো, বিশেষত Partially Hydrogenated vegetable oil বা আংশিকভাবে হাইড্রোজেনেটেড উদ্ভিজ্জ তেলে থাকা সেই উৎপাদিত শ্রেণীর ট্রান্স ফ্যাট বর্জনীয়।

কোন্ খাদ্য গ্রহণীয় ?

ট্রান্সফ্যাট বিবর্জিত খাদ্যদ্রব্যও পুরোপুরি স্বাস্থ্যকর নয়। কারণ খাদ্যপ্রস্তুতকারকরা ট্রান্সফ্যাটের পরিবর্তে অন্যান্য সম্পৃক্ত ফ্যাট সমৃদ্ধ অস্বাস্থ্যকর উপাদান, যেমন - নারকোল তেল, পাম কার্নেল থেকে প্রস্তুত তেল ও পামতেল ব্যবহার করতে পারে। এই সম্পৃক্ত ফ্যাট সমূহ রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে। একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকায় মোট গৃহীত দৈনিক ক্যালোরির ২০ -৩৫ শতাংশ ফ্যাট থেকে প্রাপ্ত। তাই দিনে গৃহীত মোট ক্যালোরির ১০ শতাংশ হওয়া উচিত সম্পৃক্ত বা saturated ফ্যাট থেকে প্রাপ্ত।

সম্পৃক্ত ফ্যাটের ব্যবহার অপেক্ষা Monounsaturated ফ্যাটের (উদা: অলিভ, পিনাট, canola তেল) ব্যবহার অধিকতর স্বাস্থ্যকর বিকল্প। অসম্পৃক্ত (unsaturated) ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে পূর্ণ বাদাম, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদিও হয়ে উঠতে পারে অন্যান্য পছন্দসই স্বাস্থ্যকর খাদ্য।

ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতি : ৩ জানুয়ারি,২০২১ তারিখে দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস্ (প্রোহিবিশন অ্যান্ড রেস্ট্রিকশন অফ্ সেলস্) রেগুলেশনের একটি সংশোধনীর বলে দ্য ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ্ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ২০২১ ও ২০২২ সালে ভোজ্য তেলে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডের মাত্রা বর্তমানে অনুমোদিত ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে যথাক্রমে ৩ ও ২ শতাংশে বেঁধে দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারেব ভূমিকা প্রশংসনীয়। সুনির্দিষ্ট নীতি ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যে ১ শতাংশেরও কম ট্রান্সফ্যাটের উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখনও পথ চলা বাকি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO-র পরামর্শ অনুযায়ী একজন মানুয়ের দৈনিক diet বা গৃহীত খাদ্যের প্রেক্ষিতে সম্পৃক্ত (saturated) ফ্যাটের ও ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ হওয়া উচিত যথাক্রমে ১০ ও ১ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যে সম্পৃক্ত ফ্যাটের পরিমাণ হওয়া উচিত ১০ গ্রাম। WHO-র উপরোক্ত নির্দেশিকা ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড জারিত খাদ্য দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহারের ওপর পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞারই শামিল।

সচেতনতা ও সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ :আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ীখাদ্য উপাদানসমূহ চয়ন করাকালীন সবাইকে সজাগ, সতর্কও সচেতন থাকার আবেদন - এই লেখনীর উদ্দেশ্য। যত বেশী পরিমাণে সম্ভব সিদ্ধ শাকসবজি ও ফলমূল সমূহ গ্রহণই এই ক্ষেত্রে উচিত। খাদ্যতালিকায় ওটস্ (oats) সংযুক্ত হলে তা অতীব স্বাস্থ্যকর। খাদ্যাভাসজনিত অকালমৃত্যু (যা বিজ্ঞানসম্মত সচেতনতার দ্বারা সহজেই এড়ানো যেতে পারে) এক-একটি পরিবারের আর্থিক প্রগতি, আজীবন ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে অতি গভীর রেখাপাত করে এবং তার দ্বারা সমগ্র সমাজ পীড়িত হয়। ব্যাপক গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও এই অসাধু ভেজালচক্রকে ভাঙার লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী আধিকারিকদের সংযুক্ত করে পবিকল্পনাকারী কর্তৃপক্ষ, আমলাতন্ত্র, চিকিৎসক সমাজ, রাজনীতিবিদ্, সামাজিক কর্মী ও হুইসল্‌ব্লোয়ারদের এক মহতী ভূমিকা এই ক্ষেত্রে আবশ্যক। নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা প্রয়োজন। তার সঙ্গে শরীরচর্চা ও সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন আধ ঘণ্টা করে হাঁটাচলা করলে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পায় এবং CVA (সেরিব্রো -ভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট /সেরিব্রাল অ্যাটাক /সেরিব্রাল স্ট্রোক), কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, ডায়াবেটিস ইত্যাদি হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

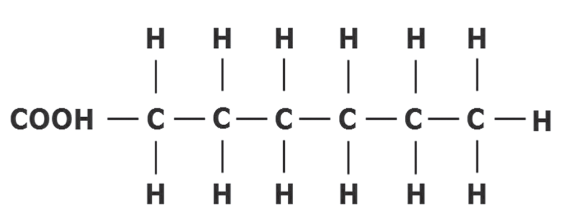

Saturated Fat

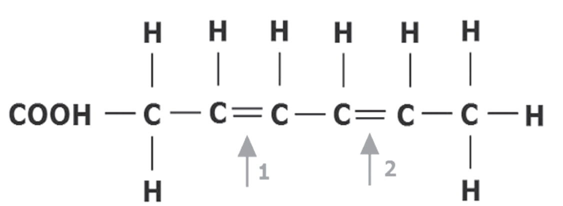

Polyunsaturated Fat

সংসদের নতুন ভবন উদ্বোধনে যোগদান না করে বিরোধীরা আত্মঘাতী গোল করলো

তারক সাহা

মে মাসের কর্ণাটকের নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় যেমন রক্তাল্পতায় ভোগা দলকে উৎসাহ জুগিয়েছে তেমনি তামাম ছিন্ন ভিন্ন বিরোধী পক্ষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা সুযোগ করে দিয়েছে। আর তড়িঘড়ি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল পশ্চিমবঙ্গে ছুটে এলেন বিরোধী ঐক্যের এক কঠিন সূত্র নিয়ে। সম্প্রতি দেশের শীর্ষ আদালত রাজ্য হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা প্রাপ্ত দিল্লির সরকারকে আমলা নিয়োগ এবং তাদের বিভিন্ন দপ্তরে বদলির সংস্থানের অধিকার রাজ্যকে দিয়েছে যেমনটা অন্যান্য রাজ্য ভোগ করে থাকে। এতদিন এই ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে কেন্দ্র। কেন্দ্র রাজ্যের এই বিবাদের জেরে শীর্ষ আদালতের রায়কে পালটে দিতে কেন্দ্র অধ্যাদেশ জারি করেছে। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী এই অধ্যাদেশটি ছয় মাস বহাল থাকবে এবং এই ছয় মাসের মধ্যে সরকারকে সংসদের দুই কক্ষের অনুমোদন নিয়ে অধ্যাদেশটিকে আইনে রূপান্তর করতে হবে।

সংসদের দুই কক্ষের মধ্যে শাসকদলের যথেষ্ট গরিষ্ঠতা রয়েছে লোকসভায়। ২৩৪টি আসন বিশিষ্ট রাজ্যসভায় শাসকদলের হাতে রয়েছে ১১০ আসন এবং অধ্যাদেশটিকে আইনে মান্যতা দিতে সরকারের দরকার আটটি ভোটের। মোদী শাসনের এই নয় বছরে সরকারের পক্ষে বরাবরই দাঁড়িয়েছে ওড়িশার নবীন পট্টনায়েকের দল বিজেডি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের জগন রেড্ডির দল। তাই এই অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত করতে এবার শাসকদলের পক্ষে অসুবিধা হবে না।

রাজ্যসভার পাটিগণিত কী সেটা বিলক্ষণ ভালো বোঝেন একদা আইআইটি-র কৃতী, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাই রাজ্যসভায় সরকারকে পরাস্ত করতে চাই একদা দুশমন সেই কংগ্রেসের হাত। গুঞ্জন হাওয়ায় ভাসতেই বেঁকে বসেছেন দিল্লি ও পঞ্জাবের অধিকাংশ কংগ্রেসের সদস্য। এই কেজরিওয়াল দিল্লির ও পঞ্জাবের নির্বাচনে ছিলেন রাজনৈতিক পয়লা নম্বর দুশমন। তাঁরা এখানেই থেমে নেই— এঁদের মতে গোয়া, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের নির্বাচনে কেজরিওয়ালের দল প্রার্থী দিয়ে ভোট কাটুয়া দল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়া ন্যাশানাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়ার বিরোধিতা করেছে।

যুক্তিসঙ্গত কারণেই এই সদস্যরা কেজরিওয়ালের দলের বিপক্ষে সরব। এখন মোদীর বিরোধিতা করতে গিয়ে কংগ্রেস অধিকাংশ সদস্যের মত উপেক্ষা করে এই অধ্যাদেশের বিরোধিতা করে রাজ্যসভায় কেজরিওয়ালের পাশে দাঁড়ায় কিনা সময়ে তা পরিষ্কার হবে।

এই আবহে গত ২৮ মে বীর সাভারকরের জন্ম দিবসে দেশের নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অবসরে দেশের রাজনীতির মূলধারার দলগুলোর আঠারোটি বিরোধী দল আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে মূল অনুষ্ঠান বয়কট করে। অতীতে গত নয় বছরে সরকারের এমন অনেক অনুষ্ঠান বয়কট করেছে দলগুলো। কিন্তু ওই দিনটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। পরাধীন ভারতের চিহ্ন মুছে দিয়ে দেশীয় প্রযুক্তি দ্বারা নির্মিত নতুন ভবনটি আক্ষরিক অর্থেই জাতীয় গৌরব। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান না করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারলো না। বীর সাভারকরের জয়ন্তী দিবসকে উদ্বোধনী দিবস হিসেবে সরকার চয়ন করায় কংগ্রেসের ঘোরতর আপত্তি ছিল। কারণ সাভারকর মরাঠা অস্মিতাসম্পন্ন ব্যক্তি। আশ্চর্যজনকভাবে মরাঠি দুই দলই অনুষ্ঠান বয়কট করেছে।

বড়ো সংসদ ভবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল সেই বিগত শতাব্দীর নয়ের দশক থেকেই। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংসদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে নয়া সদনের নির্মাণের কথা আলোচনায় থাকলেও কোনো প্রধানমন্ত্রী সেই সময়ে এই ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করতে পারেননি যা নরেন্দ্র মোদী করেছেন। আসলে বিরোধী রাজনীতি যতটা না রাজনৈতিক তার থেকে অনেক অনেক বেশি ব্যক্তিগত।

দুর্জনের যেমন ছলের অভাব হয় না, তেমনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কটের বিরোধীদের ছলের অভাব হয়নি। নতুন ভবন নির্মাণের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বিরোধীরা একা মোদীকে দিতে নারাজ। তাই এরা জিগির তুলেছে উদ্বোধন রাষ্ট্রপতি দিয়ে করানো হলো না কেন? অতীতে জাতীয় ঐক্যের বিষয়ে সব রাজনৈতিক দল সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রুলবুকে কোথাও নেই যে, এই ধরনের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে দিয়ে উদ্বোধন করাতে হবে।

এই অনুষ্ঠান বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়ে শাসকদল বিরোধী দলের উদ্দেশে কটাক্ষ করে বলেছে যে, দলগুলো সব পারিবারিক এবং দলের কেউ না কেউ দুর্নীতর অভিযোগে বিদ্ধ। সবশেষে বিরোধী পক্ষের ইস্যু ছিল সেঙ্গলের সংসদ ভবনে ঠাঁই পাওয়া। সেঙ্গল কোনো প্রতীকী দণ্ড নয়, এটার একটা ইতিহাস রয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করতে চায় সরকার। সেকুলার ধ্বজাধারী রাজনৈতিক দলগুলো একই মঞ্চে বসে কীভাবে এই পূজা দর্শন করতে পারে। অনুষ্ঠান বয়কটের এটি একটি কারণ।

সরকার জনগণের কাছে বিরোধীদের বয়কটের কথা তুলে অবশ্যই ধরবে। এই নজিরবিহীন ঘটনা আগামী প্রজন্মের কাছে এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করল। □

রাধিকার পুতুলদের বিশ্বজয়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নতুন করে বাঁচার কথা ভাবা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে ঘটনাটি যদি একটি বারো বছরের মেয়ের জীবনের হয়। মেয়েটির নাম জে এ রাধিকা। বাড়ি কোয়েম্বাটুরে। রাধিকার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন একটা দুর্ঘটনায় তার একটা পা ভেঙে যায়। পায়ের হাড় জোড়া দেওয়ার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল। অস্ত্রোপচারের পর ডাক্তারবাবুরা তিন মাসের বেড রেস্টের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ন'মাসের মধ্যে ওই জখম পায়ের হাড় আবার ভাঙল। এক বছর পর আরও একবার।

রাধিকার যখন বারো বছর বয়স তখন ওর পায়ে সাতবার অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। যে অসুখ দানা বেঁধেছে রাধিকার শরীরে তার নাম অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা। অনেকে ব্রিটল বোন ডিজিজও বলেন। এই অসুখে মানুষের শরীরের হাড় খুব সহজেই ভেঙে যায়। এমনকী বড়ো ধরনের কোনো আঘাত ছাড়াই হাড় ভাঙতে পারে। সেসব ভয়ংকর দিনের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে রাধিকা বলেন, 'আমি সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতাম। মনে হতো যদি হাঁটি তাহলেও বোধহয় আমার হাড় ভেঙে যাবে। আমি সারাদিন বিছানায় বসে থাকতাম। কথা বলার মতো কোনো বন্ধু ছিল না। জানালা দিয়ে দেখতাম বাচ্চারা রাস্তায় খেলছে, সকালে স্কুলে যাচ্ছে। অথচ আমার বাড়ির বাইরে যাওয়া বলতে ছিল হাসপাতালে যাওয়া।'

এ কাহিনি শুধু অসুখের হলে রাধিকা হয়তো জানালার পাশে বসেই জীবন কাটিয়ে দিত। কিন্তু সেরকম হয়নি। চোদ্দ বছর বয়সে সম্ভবত অসুখের সঙ্গে যোঝার জন্যই রাধিকা ড্রইং ও পেন্টিং শুরু করে। তারপর ধীরে ধীরে এমন এক শিল্পকলার সন্ধান পায় যা তাকে শুধু শিল্পী হিসেবে নয়, একজন উদ্যোগপতি হিসেবেও জীবনে প্রতিষ্ঠা দিতে সক্ষম। এই সময় থেকেই পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে পুতুল তৈরি করতে শুরু করে রাধিকা। আজ সেই পুতুলের খ্যাতি বিশ্বজোড়া।

রাধিকা যখন নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য শিল্পসৃজনের পথ বেছে নিল, ওর ভাই রাজমোহন ইউটিউবের একটা ভিডিয়ো দেখায়। পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে কীভাবে আফ্রিকান পুতুল বানানো হয় তারই সুলুকসন্ধান ছিল ভিডিয়োতে। তারপর রাধিকা পুরনো খবরের কাগজ, ধাতব তার দিয়ে পুতুল বানানো শুরু করল। ভাই রাজমোহন রঙের কাজ করত। একদিন এক প্রতিবেশী একটা পুতুল কিনলেন। সেটাই ছিল ভাই-বোনের প্রথম রোজগার।

কিছুদিন পর রাজমোহনের এক বন্ধু রাধিকার তৈরি পুতুলের প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। রাধিকার ভায়ায়, ' প্রথমদিন আমি পাঁচটা পুতুল পাঠিয়েছিলাম। পরের দিন স্টল থেকে বলা হলো আরও পাঁচটা পাঠাতে। তার পরের দিন আরও পনেরোটা। সেবার আমরা ১৫০ টাকা দরে পঁচিশটা পুতুল বিক্রি করেছিলাম।'

২০১৮ সাল থেকে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও লিংকডিনের মাধ্যমে পুতুল বিক্রি করছে রাধিকা। জীবনের প্রথম বড়ো অর্ডারের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে রাধিকা বলেন, 'আর একবার সোশ্যাল মিডিয়া মারফত উটির এক হোটেল মালিকের কাছ থেকে পঁচিশটা পুতুলের অর্ডার পেলাম। সাড়ে তিন ফুট উচ্চতার পুতুলের অর্ডার। আমি উটি যেতে পারিনি কিন্তু জেনেছিলাম আমারই তৈরি করা পুতুল দিয়ে সাজানো হয়েছে হোটেলটি।

কে বলবে আজকের এই তেইশ বছরের মেয়েটি একদিন জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীটা দেখা ছাড়া কাজ ছিল না। আজ পৃথিবীটা ঢুকে পড়েছে ওর দুহাতের ছোট্টো মুঠোয়। বারবার মুখ থুবড়ে পড়েও লড়াই থামায়নি রাধিকা। জীবনও এই হার-না-মানা মেয়েটিকে পুরস্কার দিতে ভুল করেনি □

কর্ণের উদারতা

একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। গল্প করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের প্রসঙ্গ এনে তার উদারতার খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। কর্ণের প্রশংসা শুনতে অর্জুনের মোটেই ভালো লাগছিল না। অর্জুন গল্পের মাঝখানেই বললেন— হে শ্যামসুন্দর, আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চেয়ে উদার আর তো কেউ নেই। তবু আপনি কর্ণের এত প্রশংসা করছেন কেন? শ্রীকৃষ্ণ বললে, সখা, পরে একসময় তোমাকে বুঝিয়ে বলব।

কিছুদিন পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দুজনেই যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় পৌঁছলেন। সেদিন ভোর থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি চলছে। চারদিক জলে থইথই করছে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমাদের একমন শুকনো চন্দনকাঠের খুব প্রয়োজন। আপনি যদি দয়া করে জোগাড় করে দেবার ব্যবস্থা করেন তাহলে খুব ভালো হয়। মহারাজা যুধিষ্ঠির রাজধানীতে লোক পাঠালেন শুকনো চন্দনকাঠের জন্য, কিন্তু দু'তিন সেরের বেশি কোথাও পাওয়া গেল না। যুধিষ্ঠির হাত জোড় করে বললেন, হে ব্রাহ্মণ দেবতা, আজ শুকনো চন্দনকাঠ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, আপনারা অন্য কিছু চেয়ে নিন। ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণার্জুন বললেন, না মহারাজ, আমাদের অন্য জিনিসের প্রায়োজন নেই। তাঁরা মহারাজাকে অভিবাদন জানিয়ে রাজদরবার ত্যাগ করলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসভা থেকে বেরিয়ে তাঁরা দুজন কর্ণের বাসভবনে এলেন। কর্ণ খুব শ্রদ্ধাভারে তাঁদের আপ্যায়ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমাদের একমন শুকনো চন্দনকাঠের খুব প্রয়োজন, দয়া করে যদি জোগাড় করে দেন তাহলে খুব ভালো হয়। বলার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ ধনুর্বাণ তুলে নিলেন এবং তির নিক্ষেপ করে তাঁর মহলের মূল্যবান দরজা-জানালা, আসবাবপত্র ফালা ফালা করে কেটে স্তূপীকৃত করে ফেললেন। কর্ণ বললেন, হে ব্রাহ্মণ দেবতা, এগুলি চন্দনকাঠ। একমন হবে। আমি আপনাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, মহাশয়, আপনি আমাদের জন্য এমন সব মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট করে ফেললেন? কর্ণ হাত জোড় করে বললেন, এই সময় বৃষ্টি হচ্ছে। বাইরে থেকে চন্দনকাঠ আনতে দেরি হতো। তাতে আপনাদের সময় নষ্ট হতো। কাঠও সব ভিজে যেত। আর এসব জিনিসপত্র তো আবার তৈরি করে নেওয়া যাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমার এখান থেকে আপনাদের খালি হাতে ফিরে যেতে হতো। এই দুঃখ আমার কখনোও দূর হতো না। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে ধন্যবাদ জানিয়ে অর্জুনকে নিয়ে চলে এলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, সখা, দেখলে তো! মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসভায়ও এমন বহু মূল্যবান চন্দনকাঠের জিনিসপত্র ছিল। কিন্তু এসব জিনিসের কথা তাঁর মাথায় আসেনি। কর্ণের মাথায় সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। আর তাই কোনোরকম চিন্তা না করেই তার ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র ভেঙে আমাদের দিয়ে দিলেন। কর্ণের স্বভাবের মধ্যে উদারতা রয়েছে। আর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির চিন্তাভাবনা করে ধর্মকর্ম করেন। এজন্যই আমি কর্ণের প্রশংসা করছিলাম।

ছোটো বন্ধুরা, পরোপকার, উদারতা, ত্যাগ, দানশীলতা প্রভৃতি ভালো কাজ করার স্বভাব তৈরি হওয়া চাই। যারা প্রতিদিন ভালো কাজ করে না আর ভাবতে থাকে সুযোগ এলে কোনো বড়ো ত্যাগ অথবা কারও উপকার করা যাবে, তাদের কাছে সেইমতো সুযোগ এলেও তারা তা করতে পারে না। কেননা, তাদের অভ্যাসের মধ্যে তা নেই। তাই যখনই কোনো সুযোগ আসবে , সঙ্গে সঙ্গে করতে পারলে ধীরে ধীরে তা স্বভাবে পরিণত হয়ে যাবে।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

সিধু ও কানু মুর্মু

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম দিকের সাঁওতাল বিদ্রোহের দুজন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এই দুই ভাই। তাঁদের অন্য দুই ভাইয়ের নাম হলো চাঁদ ও ভৈরব মুর্মু। তাঁদের জন্ম অধুনা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাহেবগঞ্জের ভগ্নাডিহি গ্রামে। তারা হুল দিবসের সূচনা করে টানা একবছর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখেন। কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সিধু গ্রেপ্তার হন। পরে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কানুকে বটগাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়। অন্য দুই ভাই ভৈরব ও চাঁদ ভাগলপুরের কাছে এক ভয়ংকর যুদ্ধে প্রাণ বলিদান করেন।

জানো কি?

- প্রতি বছর ২২ মার্চ পালিত হয় বিশ্ব জলদিবস।
- পৃথিবীর মোট জলের ৯৭ শতাংশ সমুদ্রের নোনা জল।
- ২ শতাংশ জল বরফ হয়ে হিমবাহ বা অন্য জায়গায় জমে রয়েছে।।
- পৃথিবীতে মানুষের ব্যবহারের জন্য রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ জল।
- আমেরিকা সবচেয়ে বেশি জল অপচয় করে ।
- জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ৮থেকে ৯ মিঃ গ্রাঃ প্রতি লিটারে।
- প্রাকৃতিক কিডনি বলা জলাভূমিকে।
- ঝরনার জল বিশুদ্ধতর।

ভালো কথা

ছাদবাগান

এবার খুব বেশি গরমের জন্য অনেক আগেই স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। কদিন পরেই আমরা রানাঘাটে মামাবাড়ি গিয়েছিলাম। একদিন মামার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখি, ছাদ জুড়ে বাগান। দুটো টবে বেগুনগাছ। তাতে বেগুন ধরেছে। একটা টবে লঙ্কাগাছ। গাছভর্তি লঙ্কা। একটা লম্বা মতো পাত্রে কয়েকটা ঢ্যাঁড়সগাছে গাছভর্তি ঢ্যাঁড়স। একটা বড়ো টবে লিচুগাছে লিচু পেকে আছে। মামার বন্ধু বললেন, আমাদের লঙ্কা, বেগুন, ঢেঁরস কিনতে হয় না। সারা বছর হয়। মা বলল আমাদেরও ছাদে অনেক জায়গা আছে। আমরাও তো করতে পারি। মামার বন্ধু মাকে বললেন আমাদের বাড়ি এসে ছাদবাগান করা শিখিয়ে দিয়ে যাবেন।

দেবাংশু আচার্য, অষ্টম শ্রেণী, কাশীপুর, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ড়ো জ জা হা

(২) র প ত্ত ত্র

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ধ্য ধ সা সা অ ন

(২) আ বা কা শ্র লি ম

২৯ মে সংখ্যার উত্তর

(১) অগ্নিপরীক্ষা (২) অনাবশ্যক

২৯ মে সংখ্যার উত্তর

(১) অনাহারজর্জরিত (২) আইবুড়োভাত

উত্তরদাতার নাম

(১) দেবরূপা কর্মকার, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।(২) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা (৩) সুরঞ্জনা মণ্ডল, রবীন্দ্রনগর, বারুইপুর, কল-১৪৪।(৪) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

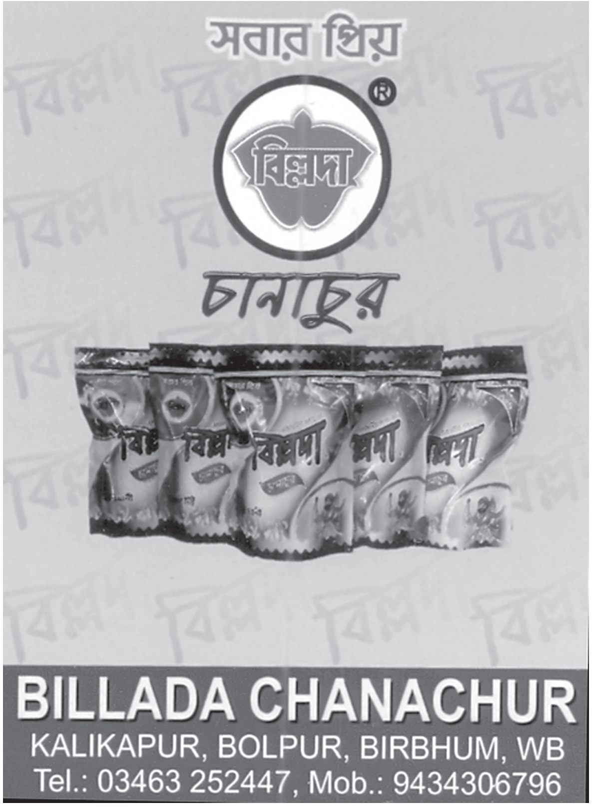

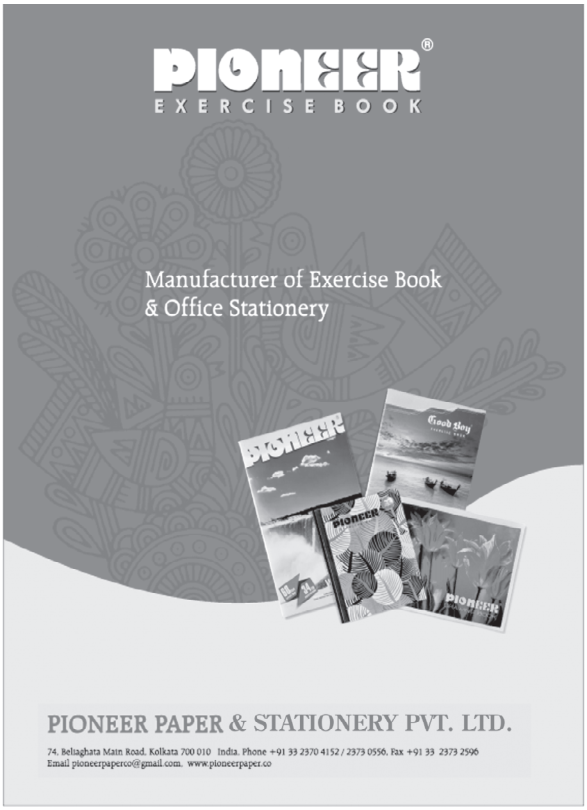

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ভিন্ন জনগোষ্ঠীর অভিন্ন জ্যোতিষকথা

সৌমেন নিয়োগী

সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন সভ্যতার ঊষা লগ্নেই সূচিত হয়েছিল বিভিন্ন প্রাচীন মানব গোষ্ঠীর নিজ নিজ পুরাণকথা, যাকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বলে এসেছি অর্থহীন। প্রাচীন মানুষের এই পুরাণকথার জন্মের নেপথ্যে যে ধারণা ছিল তা হলো প্রকৃতির বিস্ময়কর জগৎ— যেখানে সূর্য, চন্দ্র, বজ্র, মেঘ, বৃষ্টি-সহ অগুনতি নক্ষত্রের আলোকে দীপ্ত নীহারিকার ভিড়ের জালে কল্পিত বিভিন্ন তারায় তারায় গ্রহ, গ্রহাণু ইত্যাদির সমন্বয়ে নির্মিত রাশিচক্র। তাই জ্যোর্তিবিজ্ঞানই হয়ে উঠেছিল মানুষের সর্বপ্রথম প্রাচীন বিজ্ঞান যার ব্যাপ্তি স্থান ও সময়ের সমস্ত বেড়াজালকে অতিক্রম করে, সমগ্র পদার্থের ভারকে বুঝতে সক্ষম হয়েছিল। কাজেই প্রাচীনকালে বিজ্ঞান ও ধর্ম হয়ে উঠেছিল একই বস্তু। তাঁরা প্রকৃতিকে নিজেদের মতো এক প্রাণবন্ত সত্তা হিসেবে মনে করে ঈশ্বরকে আরোপ করেছিল মনুষ্যদেহ। এরই ফলস্বরূপ সকল দেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর উৎসবগুলি সেই প্রকৃতির পটপরিবর্তনের খেলার মধ্যে পালিত হয়ে চলেছে আজও সেই অতীতের ধারাকে বজায় রেখেই, যদিও কালের অমোঘ নিয়মে এইসব জনগোষ্ঠীর ধর্ম, আচার ও অবস্থান একে অপরের থেকে পৃথক স্থানে অবস্থিত। এখানে আমরা দেখি উত্তর অয়নান্ত কর্কট ক্রান্তি সূর্যের উত্তরগতির শেষ সীমা, দক্ষিণ অয়নান্ত সূর্যের দক্ষিণ গতির শেষ সীমা, মহাবিষুব ও জলবিষুব এই মাহেন্দ্রক্ষণগুলিতেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন উৎসব যা কার্যত সেই প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের উপরেই দাঁড়িয়ে।

২১ ডিসেম্বর হলো উত্তর গোলার্ধের সবচেয়ে ছোটোদিন যা দক্ষিণায়ন নামে পরিচিত অর্থাৎ ওইদিন সূর্যের উত্তরগোলার্ধ অভিমুখে যাত্রা। ৪০০০ বছর আগেও এই একই ঘটনা হতো যখন আজকের মতো সূর্য মকররাশিতে প্রবেশ না করে করত ধনুরাশিতে এবং এই সূর্যের উত্তরায়ণ শুরুর পরই ক্রমশ দিনের বৃদ্ধি হতে থাকে এবং সূর্যের গতিপথ উত্তরমুখী হতে থাকে এবং দক্ষিণায়নের শেষে ২৫ ডিসেম্বর দিনটি ন্যাটিভিটি অব মিথ্রা এবং ক্রিসমাস বলে পরিচিত। কাজেই মিথ্রা উপাসকরা এই দিনে পালন করেন ষাঁড়ের মাংস-সহ সুরা দিয়ে আনন্দের মহাভোজ এবং খ্রিস্টানরা কাটেন কেক, বলেন 'Merry Xmas'। হিন্দুরা পৌষের শেষে যাকে বলেন মকরসংক্রান্তি যা বিভিন্ন মিষ্টান্ন সেবনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বৈদিকযুগে মকররাশিকে অজ একপদ বলা হতো যা পরবর্তীকালে কুমির বলে পরিচিতি লাভ করে। যেহেতু মকর ধনুরাশিতে এই দক্ষিণায়নের শেষে প্রবেশ করেছিল ফলে তা আমেরিন্ডেসদের কাছে হয়ে উঠেছিল যুদ্ধের দেবতা স্বরূপ। ধনু হলো ধনুর্ধর, মহাযুদ্ধের দেবতা, যা মিশরীয়দের কাছে সুতেম্, ব্যাবিলনীয়দের মারডুক, আসিরীয়দের অসুর, জোরাস্ট্রিয়ানদের আহুরামাজদা, গ্রিকদের আরটেমিস এবং বেদের রুদ্র।

২২ সেপ্টেম্বর হলো জলবিষুব যখন সূর্য কন্যারাশিতে প্রবেশ করে। প্রাচীনকালে ব্যবিলনে কন্যা পূজিত হবে ইশাতার রূপে, সিরিয়াতে অশেতার, মিশরে আইসিস্ এবং হেলাসে অর্থাৎ গ্রিসে অ্যাফ্রোডাইট রূপে। ভারতেও দুর্গাপুজোর সময় কন্যা কুমারীরূপে পূজিত হয়। সুদূর অতীতে ব্যাবিলনীয়রা ও চীনারা এই দিনটিকে অত্যন্ত শুভ মনে করে তাদের নববর্ষের সূচনা স্বরূপ হিসেব করত এক মহোৎসবের দিন বলে। কার্যত অধিকাংশ হিন্দুও এইরূপ মত পোষণ করে। বর্তমানে তুলা যখন কন্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এর ফলে ব্যবিলনের ইশাতারের হাতে উঠেছে ন্যায়দণ্ড। শরৎ বা হেমন্ত ঋতু যেহেতু শস্য তোলার সময়, কাজেই কন্যার হাতে উঠেছে ধানের ছড়া। যেখানে মিথুন চিহ্নিত করছে মিশরীয় বায়ু দেবতা 'সু' ও তাঁর সঙ্গী 'তেফ্‌নাত' সিরিয়ার বল ও আশতারেত, হিন্দুর হর ও পার্বতী, গ্রিক ক্যাসটর ও পোলাকসদের রমণক্রীয়া।

২১ মার্চ পালিত হয় মহাবিষুব, প্রাচীনকালে সূর্য মেষরাশি অতিক্রম করে বৃষরাশিতে অবস্থান করত। ফলে প্রাচীনকালে মিথ্রা উপাসকরা এই সময় বৃষ বলি দিতেন। ফলে এটিই খ্রিস্টানদের ইস্টার। ইহুদিদের পাসওভার, মুসলমানদের ইদ, হিন্দুদের চৈত্রসংক্রান্তি, দোলযাত্রা, অর্থাৎ 'সুইংঅফসান' এবং মদন ত্রয়োদশী। ফলে হোলি উৎসব পালিত হয়। ২৪০০ খ্রিস্টপূর্বে সুমেরীয় সভ্যতায় দেখা যায় নববর্ষ সূচনার দিনটি হলো এই মহাবিষুব এবং ফলত ১১ দিন ব্যাপী উৎসব। বাঙ্গালি হিন্দু তাদের নববর্ষের দিন এই মহাবিষুবকে রেখেই পালন করে। ইহুদিরাও তাঁদের পাসওভারের ১০ দিন পালন করে ঝলসানো মেষ সেবন করে। যেহেতু বৃষের রং রুদ্রের বিপরীত। নন্দী বৃষভ হলো শিবের বাহন এবং বৃষভ হিন্দুদের দ্বারা বিশেষভাবে পূজিত।

২১ জুন হয় উত্তরায়ণ। উত্তর গোলার্ধের বৃহত্তমদিন। এর পর থেকে দিনের দৈর্ঘ্য কমতে শুরু করে। পালিত হয় রথযাত্রা অর্থাৎ সূর্যের উপবৃত্তকার পথে যাত্রায় সূর্যের প্রবেশ সিংহ রাশিতে এবং তাই হলো প্রাচীন মিশরীয়দের 'আমন-রা'। ঋকবেদের (১.২২.১৮) বিষ্ণুর ত্রিপাদ হলো উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চলন এক বিষুব থেকে উত্তরায়ান্ত ও দক্ষিণায়ান্ত হয়ে আরেক বিষুব। এই পথে তাঁর অবতার স্বরূপ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ এবং এক শৃঙ্গ যা তুলনামূলক পুরাণকথা ও পুরাতত্ত্বের নিদর্শন এই সকল জটিল অনুসন্ধানকে বুঝতে সাহায্য করে। এখানে মনে রাখতে হবে জনগোষ্ঠীকে কখনোই ভাষা, শিল্পকলা, জাতীয়তাবোধের বেড়াজালের সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না, কারণ বিজেতাজাতি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের ভাষা, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি বিজিত জাতির উপর চাপিয়ে দিতে চায়, কিন্তু পুরাতত্ত্বের আলোকে তাঁদের সেই জাতিগত উৎসব, সত্যতা ফুটে উঠে নিপুণভাবে। □

বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো অসুখ

শঙ্কর প্রসাদ পাহাড়ী

গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, পুকুরভরা মাছ। সেই গোলা নেই, গোলার ধানও নেই। গোয়াল নেই, গোয়ালের গোরুও নেই। পুকুর যদি-বা কিছু আছে, সে পুকুরে মাছ নেই। কারণ বাঙ্গালির যৌথ পবিরার নেই। সারা বছরের ধান ভরে রাখার মানসিকতা নেই। তারপর হাইব্রিড— দোফসলি ধান বেশিদিন ধরে রাখাও যায় না। রাসায়নিক ও কীটনাশক দেওয়া হাউব্রিড ধানের চালে ভাত, পান্তা, মুড়ির সেই স্বাদও নেই। ফাস্টফুড খাওয়ার ফলে দুগ্ধজাতীয় খাবার খাওয়ার চাহিদাও নেই। পাওয়ার টিলারে জমি চাষ হওয়ায় বলদ, গোরু রাখার চাহিদাও নেই। গোরু না থাকায় জৈব সার নেই। পুকুরে মাছ নেই। ভাগের পুকুর প্রতি বছর শুকিয়ে দেওয়ার ফলে দোফসলি চাষের সার, ওষুধের ব্যবহারে খাল বিলে মাছ নেই। এছাড়া নানান হাইব্রিড রাক্ষুসে মাছ পুকুরে ছাড়ার ফলে দেশি মাছ তাদের গ্রাসে চলে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের পাতে কুচো চিংড়ি, চুনোপুঁটি অদৃশ্য। একইভাবে শাকসবজি, আনাজপাতি যার অনেকটাই বিনা যত্নে গৃহস্থের বাড়ির আনাচেকানাচে জন্মাত, সেও আজ অদৃশ্য। লাউ, কুমড়ো, পেঁপের মতো আনাজের দামও আকাশছোঁয়া। তাল, নারকেল, আম, জাম, কাঁঠাল পেয়ারা ইত্যাদি ফলের সেই প্রাচুর্য নেই। থানকুনি, কলমি, শুশনিশাক যা পুকুরপাড়ে, আনাচেকানাচে হতো, লোকে অনায়াসে পেত, পেট ভরে খেত, খাদ্য ও ওষুধের কাজ দিত, তাও আজ অদৃশ্য। অসুস্থ বাঙ্গালি খাচ্ছে কী, খাবে কী?

পশ্চিমবঙ্গ যা খণ্ডিত বঙ্গের এক রূপ। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালির অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, বাসস্থান নেই, কুটিরশিল্প নেই। বাঙ্গালি ছিন্নমূল, বাঙ্গালি বিতাড়িত। এই একতরফা বিতাড়িত হওয়ার কোনো প্রতিবাদ নেই, প্রতিকার নেই। একটাই চিন্তা— যে যেখানে যেমন পারো বসে পড়ো, দখল করো,

মারামারি করো, ভাঙচুর করো, টিকে থাকো। গাছ কাটো, পুকুর ভরাট করো, টিকে থাকার বাসস্থান গড়ে কোনোমতে মাথা গোঁজো। যাদের একটু সুরাহা হয়েছে তারা রাজনীতি করো, হয় কংগ্রেস করো, নয় কমিউনিস্ট হও। চুরি করতে চাইলে তৃণমূল হও। কোনো দল ভালো না লাগলে নতুন দল করো। অফিসে কাজ পেয়েছ, এবার ইউনিয়ন করো। নিজের হিসেব ষোলোআনা বুঝে নাও। কাজে যত পারো ফাঁকি দাও। অস্থির বাঙ্গালি, অসুস্থ বাঙ্গালি।

বাঙ্গালি রোগী হিসেবে সর্বস্বান্ত, উপেক্ষিত, অবহেলিত। প্রতিকার না খোঁজা, প্রতিবাদ না করা বাঙ্গালির স্বভাব। সাম্প্রদায়িক শক্তির হাতে মার খেয়ে পালিয়ে বসে বাঙ্গালি। তাদের সঙ্গে নিয়ে নিরপেক্ষতার পরীক্ষা দিতে গিয়ে বাঙ্গালি আজ অসুস্থ, দিশেহারা, সৃষ্টিছাড়া। মানসিক ও সামাজিক ব্যাধিতে দুর্দশাগ্রস্ত। পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতালে রোগী ধরে না। হাজার হাজার নার্সিং হোম, রোগী ধরে না। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা ডাক্তার, কোয়াক ডাক্তার রোগী দেখে শেষ করতে পারেন না। দক্ষিণে ছুটতে হয় এ রাজ্যের রোগীদের। হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ভেলোর, চেন্নাই, মুম্বাই, দিল্লি সর্বত্র বাঙ্গালি রোগীর সংখ্যা ৮০ শাতংশ।

কর্মহীন, ধর্মহীন, মর্মহীন এ রাজ্যের রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি মানে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার রাজনীতি। এরাজ্যের ঘরে ঘরে বাবা-ছেলে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, মায়ে-ঝিয়ে বিষাক্ত নীতিহীন রাজনীতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতি মুহূর্তে ঈর্ষা ও হিংসার করাল রূপ। ক্ষমতায় আসা ও ক্ষমতায় থাকার জন্য নিরেট, নিষ্ঠুর এক রাক্ষুসে অত্যাচারের শিকার রাজ্যের আপামর জনতা। ক্ষমতায় থাকার জন্য দলের লোককে পাইয়ে দাও, উসকে দাও, লেলিয়ে দাও। এসসি, এসটি, ওবিসি, সংখ্যালঘু করে বিভেদ আনো ও লড়িয়ে দাও। এখানকার রাজনীতিতে 'সবার উপরে মুসলমান সত্য তাহার উপরে নাই' মেনে নাও। পাকিস্তানের সমর্থক সেই সর্বগ্রাসী মুসলমানদের ভারতীয় নয়, ভোটার বানিয়ে, সংখ্যালঘু সাজিয়ে, সব সুযোগসুবিধা পাইয়ে দিয়ে দলে রাখো। তাদের দিয়ে মিথ্যা, ছলনা ও চালাকির দ্বারা বিরোধীদের কোতল করো— এই সৃষ্টিছাড়া রাজনীতি বাঙ্গালির একটি অসুখ। কোনো উচ্চ মূল্যবোধ, আদর্শ, ত্যাগের প্রেরণা নয়— কেবল পাইয়ে দাও।

অখাদ্যই বাঙ্গালির প্রিয় খাদ্য। তেলেভাজা, চাউমিন, রোল, বিরিয়ানি ইত্যাদি ফাস্টফুড হিসেবে রাস্তাঘাটে, হোটেলে, রেস্টুরেন্টে, চায়ের দোকানে বাঙ্গালি খেতে অভ্যস্ত। খাদ্যের শুচিতা, পবিত্রতা এইসব খাদ্যে না থাকলেও। যারা প্রস্তুত করছে তাদের মলিন বস্ত্র। বিড়ি, সিগরেট, খৈনি খেতে খেতে, কথা বলতে বলতে খাদ্য পরিবেশন করছে। রাস্তার ধারের ধুলো-বালি, বিষাক্ত তেল-মশলা, রাসায়নিক খাদ্যগুলিকে আরও বিষাক্ত করে তুলছে। তেলের ঘানি নেই, খাঁটি

সরষের তেল নেই। পেঁয়াজ, রসুন, আদা , মাছ-মাংস সব হাইব্রিড। ফলে এই বিষাক্ত খাবার খাওয়া বাঙ্গালির অসুখ ছাড়া আর কী হতে পারে?

বাঙ্গলির নেশা — নেশার বাঙ্গালি। আমোদপ্রিয় বাঙ্গালি আজ হাজার নেশার শিকার। বিড়ি, সিগারেট, খৈনি, গুটকা তো আছে, তাছাড়া গাঁজা, চরস আর লাল-নীল জলের ও চুল্লুর অফুরন্ত ফোয়াড়ায় ধনী-দরিদ্র বাঙ্গালি সব বুঁদ। সরকারের সান্ত্বনা— তার আবগারি শুল্ক থেকে আয় হচ্ছে। ব্যবসায়ীর পাওনা তার ব্যবসা যাতনায় কাতর বাঙ্গালির গর্ব পাকস্থলী ও যকৃতের বিকৃত অসুখ।

বিনোদন পাগল বাঙ্গালি। বারো মাসে তোরো থেকে তেত্রিশ পার্বণ নিয়ে বাঙ্গালি উৎসবের নেশায় বুঁদ। আগে কালীপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি উৎসবে বাঙ্গালি মাততো। এখন এসব তো আছে তার উপর পাড়ায় পাড়ায় লোকাল উৎসব, অনুষ্ঠান, ফুর্তি। দাও, চাঁদা দাও। সারা রাত গানবাজনায় মেতে থাকো। দেবতুল্য শিল্পীদের হাতের কাছে পেয়ে ছাড়া যায়! চলো, উৎসবে চলো। শরীর মনের চাহিদা বিচার করার দরকার নেই। আনন্দ করবো চলো। মূর্তি থাক, প্যান্ডেল থাক, আলোর রোশনাই থাক, নমো নমো করে পূজাও থাক। খুব মন চাইলে একবেলা একটু উপোস করে, একটু পুষ্পাঞ্জলি দিলেই ধর্মকর্ম শেষ। বাকিটা অখণ্ড ফুর্তি। ফুর্তির নেশা কাটতেই আবার কোনো এক গর্বের ব্যাধির ইশারা। চলো ভেলোর অথবা ব্যাঙ্গালোর।

অফুরন্ত টক টাইম। যে বিষয়টা বাঙ্গালি জানে না, কোনো ধারণা নেই, সেই বিষয় নিয়েও যদি তাকে বলতে দেওয়া হয় বা সুযোগ পায়, সে বলে যাবে। থামবে না, দমবে না। অপ্রয়োজনীয় তর্ক করা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা, সমালোচনা করা, টেবিল চাপড়ে কথা বলা বাঙ্গালির মজ্জায়। মোবাইল ফোনে কথা চলছে তো চলছেই। টিভি, ম্যাগাজিন, হাজারো সিরিয়াল দেখা এবং হাজারো খবরের কাগজ পড়া বাঙ্গালির স্বাভাবিক ঘুম নেই।। অনেক রাতে ঘুমোতে গিয়ে এবং সকালে অনেকটা ঘুমিয়ে ক্লান্ত বাঙ্গালির গর্ব বেশ কিছু দুরারোগ্য অসুখ। চোখের ডাক্তারের কাছে শিশু, বৃদ্ধের লাইন। চশমা চোখে বাঙ্গালি গর্বিত।

সহশিক্ষা, অবাধ মেলামেশা। স্কুল-কলেজে ছেলে-মেয়ে কো-এডুকেশনের ফলে অবাধ মেলামেশা করতে গিয়ে এক জটিল অসামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হচ্ছে। হাজারো রকমের ব্যাধিতে ভুগছে বাঙ্গালি। বাবা-মার একটি-দুটি ছেলে-মেয়ে হওয়ার ফলে ওই পরিবারকেও ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন গর্বের ব্যাধি। জন্ম নিচ্ছে মানসিক ভারসাম্যহীন বিকলাঙ্গ প্রজন্ম। পোশাক পরিচ্ছদ রুচিহীন। টিভি, সোশ্যাল মিডিয়া, ম্যাগাজিন, ই-মেলে অবাধ যৌন চর্চা। বিবিাহের আগেই অকাল বার্ধক্য।

মহাহিসাবি সুযোগসন্ধানী। ঘুষ দিয়েও নিজের অযোগ্য ছেলে-মেয়েকে কাজে লাগাতে হবে। কে হতাশ হলো, কার দীর্ঘশ্বাস পড়লো, কোন পরিবার খেতে পেল না দেখার দরকার নেই। আমার জন্য ,আমার ছেলে-মেয়ের জন্য চাই-ই চাই। তার জন্য দল পালটাতে পারি, মত পালটাতে পারি মন পালটাতে পারি, নীতি পালটাতে পারি। আর যদি ব্যবসায়ী হই, কত ফাঁকি দিয়ে কত বেশি আয় করতে পারি। হিসাব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে হবে। আমার রিকসা আছে, গাড়ি আছে— মাঝরাতে কেউ বিপদে পড়েছে, আমি সুযোগ নেবো। ঝড়ে ঘর ভেঙেছে, সারাতে হবে, আমি কাজের লোক — সেবা নয়, আমি সুযোগ নেবো। মা-বাবা মরেছে, মানে দোষ পড়েছে, আমি পুরোহিত, আমি দানের সুযোগ নেবো। ভালো টিউটর পাওয়া যাচ্ছে না, আমি পড়াই। আমি সেবা নয়, সুযোগ নেবো। এই অতিরিক্ত আয়ে আমি ফুর্তি করবো, বেড়াবো এবং একটা গর্বের অসুখ বাঁধাবো।

ছেটো পরিবার সুখী পরিবার। প্রাকৃতিক নিয়ম উপেক্ষা করে পরিবার ছোটো রাখার গর্ব করতে গিয়ে ঘন ঘন গর্ভপাত এবং অপ্রাকৃতিক গর্ভরোধের পর পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুর জন্ম হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, জন্ম নিচ্ছে হাজারো জটিল অসুখ। কমে যাচ্ছে আনুপাতিক কর্মীর সংখ্যা। প্রাকৃতিক নিয়মে স্বাভাবিক প্রতিভা নিয়ে যে শিশু গর্ভে এসেছিল, ডাক্তার নামক এক কংসের হাতে তাকে ভ্রূণেই মরতে হলো। আবার যখন গর্ভে এল-– হয় বিকৃত রূপ নিল অথবা ভয়ংকর চঞ্চল, উদগ্র কামনা বাসনা, হিংস্র হয়েই এলো। সুখী পরিবারে গর্ভগর্বে সে একাই একশো।

‘অহিংসা পরমো ধর্ম’ ও ‘সর্বধর্ম সমন্বয়’নামক দুই মহাব্যাধি। হিংস্রদের হাত থেকে অহিংসদের রক্ষা করাই প্রকৃত সমাজসেবা। ‘দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো’— এটাই প্রকৃত অহিংসা। এটাই শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা। মুখে রামনাম, কৃষ্ণনাম, মাথায় টিকি, গলায় কণ্ঠী, হাতে জপের মালা। মার যখন শুরু হলো কাছা খুলে মা-বোন-মেয়ে-বউ ফেলে, পূর্ববঙ্গ থেকে ওরে বাঙ্গালি পশ্চিমবঙ্গে পালা! ঠাকুর বলেছেন--জল, পানি, ওয়াটার, অ্যাকোয়া-- সব এক। সব ধর্ম সমান। কোনো বিচার করতে নেই। কারও ভুল ধরতে নেই। এত বড়ো অবিচার , এত বড়ো ভুল মেনে নিতে গিয়ে পুরো বাঙ্গালি জাতটা ক্যানসারে আক্রান্ত হলেও সে গর্বিত। ‘যেখানে যখন বিপদে পড়বি, আমাকে ডাকবি, আমি তোদের রক্ষা করবো।’ তবে হ্যাঁ, দেশ ছেড়ে , মার খেয়ে পালাবার সময় আমায় ভুলে যাবি। আর গর্ব করে বলতে ভুলে যাবি—‘বিপদে মোরে রক্ষা করো—এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়।’

র‍্যাগিং, হিংসা, হত্যা, মিথ্যা, ছলনা, চালাকি, বিকৃতি বাঙ্গালির সম্পদ। স্কুল-কলেজে নতুনদের উপরে পুরাতনদের র‍্যাগিং শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক, মানসিক কষ্ট দেওয়া তো আছে, অনেকক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটছে। যারা নির্যাতিত হয়ে টিকে গেল, তারাই পরের বছর নতুনদের প্রতি প্রতিহিংস্র হয়ে উঠল। এও

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

এক গর্বের ব্যাধি। ছাত্র ও অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে রাখার নতুন কৌশল। মুরগি, পাঁঠা, গোরু অবাধে সর্বসমক্ষে কাটো। পারলে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটো। শিশুমনে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হোক, হিংসা জন্ম নিক। বিরোধীদের পশুর মতো হত্যা করো। ধরা পড়লে পচে মরো, কেটে পড়লে গর্ব করো। মিথ্যা, ছলনা, চালাকির আশ্রয় নাও, একে অপরকে টেক্কা দাও। এর ফলে জন্ম নিক নিত্যনতুন অসুখ, মানসিক যন্ত্রণা। এই মানসিক বিকৃতি ও ব্যাধি থেকেই জন্ম নিচ্ছে আলসার, ক্যানসার, সুগার।

এ তো গেল ৮০ শতাংশ অসুস্থ বাঙ্গালির কথা। ২০ শতাংশ সুস্থ, আপাতসুস্থ বাঙ্গালি সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি ও স্বাস্থ্য নিয়ে কী চিন্তা করছে?

(১) সেই তো এই রাজ্যে সবাইকে নিয়ে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি থাকতে হচ্ছে। তাহলে চোদ্দপুরুষের ভিটেমাটি পূর্ববঙ্গে হারাতে হলো কেন? সবার জন্য সমান আইন, সমান সংস্কারসূত্র মেনে পুর্ববঙ্গই-বা ফিরে পাবো না কেন? উচ্ছেদ হওয়া ইহুদিরা যদি তাদের দেশ ফিরে পেতে পারে, তবে হিন্দু বাঙ্গালিরা পারবে না কেন? পারবে, যদি উৎকৃষ্ট জাতীয়তাবোধের পরিচয় হিন্দু বাঙ্গালি দিতে পারে। একতরফা বিচার, অত্যাচার, একতরফা অনুপ্রবেশ কোনো দেশের কোনো জাতির সমস্যার সমাধান করতে পারে না। হিংসা নতুন এক হিংসার জন্ম দেয়। একটু সুস্থ, সাহসী, প্রাণবন্ত চিন্তা করতে অসুবিধা কোথায়? পশ্চিমবঙ্গ যখন আছে, পূর্ববঙ্গও ফিরে আসুক। হোক অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ। যদি তা না হয় হোক লোকবিনিময়। দুই জার্মানি এক হতে পারলে দুই বঙ্গ এক হতে পারবে না কেন?

(২) পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি ক্রমশ কমছে। হিন্দু শরণার্থীর চাপ তো আছেই, মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরর সংখ্যাও কম নয়। নিত্যনতুন অবৈধ কারখানা গড়ে উঠছে। ঘরবাড়ি উঠছে। আইন করে চাষযোগ্য জমি সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যৌথ পরিবার ফিরিয়ে আনতে হবে, তারজন্য পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে যৌথ পরিবারকে উৎসাহিত করতে হবে। গ্রামে গ্রামে জমি অনুযায়ী গোপালন বাধ্যতামূলক করতে হবে। অশক্ত গোরুর খামার তৈরি করে গোময়, গোমূত্রকে জাতীয় সারের মর্যাদা দিতে হবে। বার্ধক্যভাতা পাওয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের গোপালনে যুক্ত করতে হবে। জাতিগত সংরক্ষণ প্রথা তুলে দিতে হবে। সরকারি রাস্তার ধারে, পুকুরপাড়ে, লেকের গায়ে ফল, ফুল,ঔষধী গাছ লাগাতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, তাল, নারকেল, বট, অশ্বত্থ গাছ লাগাতে হবে। যারা সরকারি ভাতা পান, তাদের দায়িত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে গাছ পাহারার কাজে লাগাতে হবে।

(৩) অযোগ্য লোককে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে। রাজনীতির জন্য স্তর অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ৫০ থেকে ৭০ বছর বয়স জনপ্রতিনিধিদের জন্য বেঁধে দিতে হবে। ছাত্রজীবনের পর, সংসারজীবনে উপার্জনশীল ও সামাজিক কর্মী হিসেবে ২৫/৩০ বছরের অভিজ্ঞতা না থাকলে জনপ্রতিনিধি হতে পারবে না। রাজনীতি যাতে জীবিকা ও পেশা না হয় তারজন্য তিনবারের বেশি কেউ দাঁড়াতে পারবে না। মিথ্যাচার, মিথ্যাভাষণ ও আইন ভাঙার জন্য প্রতিনিধিদের উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে।

(৪) স্কুল-কলেজে নীতিশিক্ষা, সংস্কৃত ও দর্শন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ধর্ম অনুশীলনের বিষয়, অনুভূতির বিষয়। ধর্মানুশীলন ছাড়া ধর্মাধর্ম বোঝা যায় না। পরচর্চা নয়, চাই ব্রহ্মচর্চা। শুধু ভক্তি নয়, শক্তিও চাই। ভুল মন্ত্র বলা পুরোহিত নয়, ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল সবাইকে উন্নত সংস্কারে দীক্ষিত করে, শিক্ষিত করে তোলার মতো ব্যবস্থা চাই। সহশিক্ষা, অবাধ মেলামেশা, ইউনিয়ন করা বন্ধ করতে হবে। রুচিহীন পোশাকপরিচ্ছদ সামাজিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৫) প্রকাশ্যে যে কোনো নেশা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে, শাস্তির বিধান থাকবে। যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ, থুথু ফেলা অপরাধ হবে। প্রতিবাদী সমাজকে রক্ষা করতে হবে। সরকারি জায়গা দখল করা, ফুটপাতে শোয়া, থাকা, খাওয়া, নোংরা করা, মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে না। অনাচারকে কোনোরকম প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।। এ জন্য যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে হবে। প্রবীণ নাগরিকরা সামাজিক অভিভাবকের মর্যাদা পাবেন।

(৬) হোটেল, রেস্টুরেন্ট মালিক ও কর্মীদের ডিপ্লোমা পাশ করতে হবে। খাদ্য প্রস্তুতকালে শূচিতা, পবিত্রতা, আবার খাদ্যের বিষক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। যে কোনো ব্যবসা, কাজ , অনুষ্ঠানে আবর্জনা সৃষ্টি হলে তা সংরক্ষণ ও উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তকরণের দায়িত্ব উদ্যোক্তাদেরই নিতে হবে।

(৭) উৎসব, অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। রাত ন'টার পর মাইক, টিভি তারস্বরে বাজানো যাবে না। রাত ১০টার পর আলো বন্ধ রাখতে হবে। তখল কেবল মানুষই বিশ্রাম নেয় না, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা সবাই বিশ্রাম নেয়।

(৮) বেদ, বেদান্ত, দর্শন থেকে প্রকৃতির নিয়ম জানতে হবে। এবং সেইভাবে শিক্ষা, কৃষি, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যচর্চা, প্রশাসন, বিজ্ঞানচর্চা এবং উন্নত সংস্কারবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। এইভারে যাঁরা চিন্তা করতে পারেন তাঁরা সংস্কারক, প্রশাসক; বাকিরা প্রতারক। থট ইজ দ্য মাদার অব অ্যাকশন— সবাই চিন্তা করতে শুরু করুন। আপনি চিন্তা করতে পেরেছেন— এটা আপনার গর্ব।

শোকসংবাদ

গত ১১ মে বহরমপুর প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক দিলীপ সরকার পরলোকগমন করেন। পথদুর্ঘটনায় তিনি মাসাধিককাল চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। তিনি তাঁর বাবা, সহধর্মিণী ও ১ কন্যাকে রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক পর্যাবরণ বিভাগের মালদহ জেলা সংযোজক জীবন মণ্ডলের পিতৃদেব আনন্দ মণ্ডল গত ২৯ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ওড়িশার ভুবনেশ্বরে লাভ জিহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঘটনাটিকে ওড়িশার 'দ্য কেরালা স্টোরি' বলা যেতে পারে। ওড়িশার ২৭ বছরের এক মহিলা লাভ জিহাদের শিকার হয়েছেন। ঘটনাটি সাম্প্রতিককালে ওড়িশায় অভূতপূর্ব রাজনৈতিক বিতর্কের সূচনা করেছে। হিন্দু সংগঠনগুলি এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, মহিলা খুর্দার একটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রী। তিনি সম্প্রতি খুর্দা মডেল পুলিশ স্টেশনে একটি এফআইআর মারফত জানিয়েছেন, এক মুসলমান যুবক নাম ও পরিচয় ভাঁড়িয়ে তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছে। এখন তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যুবকটি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েটির সঙ্গে আট বছর ধরে শারীরিক সম্পর্ক সম্পর্ক স্থাপন করে। মেয়েটি গোড়ায় রাজি থাকলেও যুবকটির আসল পরিচয় জানার পর বেঁকে বসে। এখন ছেলেটি হুমকি দিচ্ছে যে সে যদি ধর্ম পরিবর্তন না করে অথবা গোমাংস না খায় তাহলে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। রেহাই মিলবে না তার ভাইয়েরও। মেয়েটি এফআইআর-এ জানিয়েছে যে, ছেলেটির বহু মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এবং এদের একজনের সঙ্গে বিয়ের দিনও মোটামুটি ঠিক। মেয়েটির অভিযোগ, ছেলেটি ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছে কারণ তার রাজনৈতিক যোগাযোগ সাংঘাতিক। ওড়িয়া মিডিয়া আরগুনিউজ ডট ইনের মিডিয়া কভারেজেও স্বীকার করা হয়েছে যে, শাসকদল বিজেডির বেগুনিয়ার বিধায়ক রাজেন্দ্র শাহুর সঙ্গে ধৃত আলিমুদ্দিনের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। আলিমুদ্দিনের পরিবারের সঙ্গে নাকি বিধায়কের পারিবারিক সম্পর্ক। কভারেজে এও লেখা হয়েছে যে, আলিমুদ্দিনের সঙ্গে সারা দিনে এক-দুই ঘণ্টা কথা না বললে বিধায়কের দিন ভালো যায় না।

সব থেকে বড়ো কথা, খুর্দা পুলিশ স্টেশনের এফআইআর গ্রহণে অনীহা। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে মুসলমান তোষণের ছবিটা ভারতের সব রাজ্যেই একই রকম।

মধ্যপ্রদেশে আইএসআইএসের ঘাঁটির সন্ধান পেল এনআইএ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লক্ষ্য ছিল ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতকে ইসলামিক স্টেট বানানো। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র অফিসারদের সতর্কতায় আপাতত সেটা যথেষ্ট ধাক্কা খেল। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে এনআইএ-র গোয়েন্দারা ইন্টেলিজেন্স এবং অ্যান্টি টেরিস্ট স্কোয়াডের সহায়তায় সৈয়দ মামুর খান, মহম্মদ আদিল খান ও মহম্মদ সাহিদ নামের তিন জেহাদিকে গ্রেপ্তার করেছে। এরা তিনজনেই আইএসআইএসের সঙ্গে যুক্ত। গত ২৬-২৭ মে ১৩টি জায়গায় সারা রাত রেইড করে গোয়েন্দারা এদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হন।

জানা গেছে, ধৃতরা সারা দেশে ভারতবিরোধী ও হিন্দুবিরোধী প্রচারের কাজে যুক্ত ছিল। তবে মূল লক্ষ্য ছিল ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতকে ইসলামি দেশে পরিণত করা। এর আগে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সহায়তায় অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড ১৬ জন যুবককে গ্রেপ্তার করেছিল। এরা প্রত্যেকেই যুক্ত ছিল জিহাদি সংগঠন হিজব-উত্-তাহরিরের সঙ্গে। সেই অপারেশনের পর জব্বলপুরের অপারেশনকে সব থেকে বড়ো অপারেশন বলা হচ্ছে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, আপত্তিজনক কাগজপত্র এবং ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করেছেন গোয়েন্দারা। এইসব নথিপত্র থেকে ধৃতদের ভারত ও হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ্যে এসেছে। তদন্ত চলার সময় গোয়েন্দারা জানতে পারেন ধৃত মহম্মদ আদিল খান সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আইএস আইএসের কর্মসূচি ভারতে রূপায়িত করে। তবে তাদের প্রধান কর্মসূচি হলো 'দাওয়া'। ইসলামে দাওয়ার অর্থ হলো কোনো মজলিশে অমুসলমানদের ডাকা এবং ইসলামে ধর্মান্তরিত করা। তদন্তে জানা গেছে, ধৃতরা তিনজনেই চরম ধর্মীয় কট্টরবাদে বিশ্বাসী এবং ভারতে হিংসাত্মক জিহাদ রূপায়ণে বদ্ধপরিকর। গত ন'বছরে মোদী সরকার সন্ত্রাস দমনে নানা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। এনআইএ-র গোয়েন্দাদের সাফল্যকে সেই প্রেক্ষিতে একটি মাইলফলক বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মহারাষ্ট্রে পুজনীয় চরিত্র শিবাজী মহারাজ : ফড়নবিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহারাষ্ট্র সরকার কর্তৃক ঔরঙ্গাবাদ, ওসমানাবাদ ও আহমদনগরের নতুন নামকরণ করে যথাক্রমে ছত্রপতি সম্ভাজী নগর, ধরাশিব ও অহল্যানগর রাখার পরেও স্থানীয় মুসলমানদের পক্ষে ভারতীয় ব্যবস্থার সঙ্গে একাত্মকরণের বিপ্রতীপে বিদেশি ইসলামিক আগ্রাসনকারীদের মহিমান্বিত করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে ৪ মুসলমান যুবককে অত্যাচারী, হিন্দু নির্যাতনকারী মুঘল শাসক ঔরঙ্গজেবের ছবি নিয়ে নাচানাচি করতে দেখা যায়। হজরত দমবাহারির দরগায় চাদর চড়ানো উপলক্ষ্যে অহল্যানগর শহরের মুকুন্দনগর এলাকা থেকে ফকিরওয়াড়া অবধি হওয়া একটি মিছিলে একাধিক মুসলমান যুবককে ঔরঙ্গজেবের ছবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড তুলে ধরে নাচতে দেখা যায়। মহম্মদ সরফরাজ ইব্রাহিম ওরফে সরফরাজ জাগিরদার, অপনম সাদিক শেখ ওরফে খাদা, শেখ সারোয়ার ও জাভেদ শেখের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের বক্তব্য হলো ঔরঙ্গজেবের ছবি অবাঞ্ছিত ও বর্জনীয়। মহারাষ্ট্রে পুজনীয় চরিত্র হলেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ও ধর্মবীর ছত্রপতি সম্ভাজী মহারাজ। ঔরঙ্গজেবের নাম বা ছবি কেউ ব্যবহার করা হলে, তা ক্ষমার অযোগ্য।

কেরালার পুনালুরে বিজেপি কর্মীকে নৃশংসভাবে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিজেপির পুনালুর মণ্ডল কমিটির সদস্য এবং কাকোড়ের স্থানীয় বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনৈক সুমেশকে নৃশংসভাবে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। কাকোড়ের স্থানীয় সিপিএম নেতা ও ওয়ার্ড সদস্য অরবিন্দাক্ষণ এই হত্যাকাড়ের ষড়যন্ত্রী বলে অভিযোগ। একটি লাইব্রেরির বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানকে ঘিরে চলা বচসা এই খুনের জন্য দায়ী। সুমেশ সিপিএম বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় দরুন আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। ছুরিকাহত হওয়ার পর সুমেশকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তিকরা হয়। পরে তিরুবনন্তপুরম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হলে চিকিৎসকদের সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর প্রাণরক্ষা হয়নি।

কেরালার মন্দির প্রাঙ্গণে সঙ্ঘের শাখায় বামেদের নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ত্রিবাঙ্কুর দেবস্যম বোর্ড তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা মন্দির প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখার কার্যকলাপে, বিশেষ করে মাস ড্রিলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেরালার বাম সরকার দেবস্যম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বশাসিত বোর্ডের অধীনে থাকা মন্দিরগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

সাম্প্রতিক একটি সার্কুলার মারফত টিডিবি এই বলে তাদের অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে, ২০২১ সালে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল সঙ্ঘ তা অমান্য করেছে। নির্দেশিকায় পরিষ্কার বলা হয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে না। কিন্তু সঙ্ঘ এখনও তা চালিয়ে যাচ্ছে। নির্দেশিকা অমান্য করা হলে সঙ্ঘের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছে টিডিবি।

টিডিবি এর আগেও মন্দির প্রাঙ্গণে অস্ত্র প্রশিক্ষণ বন্ধ করার জন্যও সার্কুলার জারি করেছে। ২০১৬ সালে টিডিবি সঙ্ঘের সব ধরনের অস্ত্র প্রশিক্ষণ বন্ধ করার জন্য সার্কুলার জারি করেছিল। ওই সার্কুলারই ৩০ মার্চ ২০২১ নতুন করে ইস্যু করা হয়।

নাম প্রকাশ করা হবে না— এই শর্তে টিডিবির এক আধিকারিক জানান, বর্তমানে সার্কুলারের উদ্দেশ্যই হলো মন্দির প্রাঙ্গণে সঙ্ঘের শাখার কার্যকলাপ বন্ধ করা। প্রাক্তন দেবস্যম মন্ত্রী কাড়াকামপল্লী সুরেন্দরণের একটি মন্তব্যের জেরে এই নিষেধাজ্ঞা বলে মনে করছেন অনেকে। ২০১৬ সালে তিনি বলেছিলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কেরলের মন্দিরগুলিতে অস্ত্র মজুত করতে চায়।

বালাসোরে রেল দুর্ঘটনায় আহতদের রক্ষায় স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২ জুন ওড়িশার বালাসোরে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই আড়াইশোর বেশি স্বয়ংসেবক আহত রেলযাত্রীদের ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে অংশ নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ১৭০০ ইউনিট রক্তদান করেছেন। বালেশ্বর জেলার বাহানাগা রেল স্টেশনের নিকটে ঘটে যাওয়া এই রেল দুর্ঘটনা হওয়ার পরেই সঙ্ঘের স্থানীয় স্বয়ংসেবকরা এনডিআরএফ ও প্রশাসনের টিম পৌঁছনোর আগেই সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ সর্বপ্রথম ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। দুর্ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী বাহনাগা গ্রামে সঙ্ঘের শাখার থাকার দরুন প্রথমে কয়েকজন স্বয়ংসেবক পৌঁছলেও রাত বাড়লে ১০০০-এরও বেশি স্বয়ংসেবক উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ করে স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্ধারকারী জওয়ানদের সহায়তা করেন। ত্রাণকাজে গতি আনতে স্বয়ংসেবকরা অটো ও মোটরসাইকেলে করে আহত যাত্রীদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে থাকেন।

সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বগিগুলির মধ্যে প্রবেশ করে স্বয়ংসেবক রমেশজীর নেতৃত্বে সারা রাত ধরে আহতদের বের করে আনতে থাকেন স্বয়ংসেবকরা। অন্যান্যরা আহতদের অনবরত হাসপাতালে নিয়ে যেতে থাকেন। স্বয়ংসেবকরা ত্রাণকাজে শামিল হওয়া বিভিন্ন সরকারি এজেন্সি ও জওয়ানদের সঙ্গে মিলে আক্রান্ত যাত্রীদের কামরা থেকে বের করে অ্যাম্বুলেন্সে স্থানান্তরণে সহায়তা করেন। বালেশ্বর জেলা হাসপাতালে আহতদের পৌঁছানোর শুরু থেকেই সঙ্ঘের পদাধিকারীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সেবাকাজে তদারকি করেন। কিছু আহত যাত্রীকে ভদ্রক জেলা সদর হাসতাপাল ও সোরো মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেও স্বয়ংসেবকরা নিজেরা রক্তদান করে ও রক্তের যোগানের যাবতীয় ব্যবস্থা করে তাদের দায়িত্ব পালন করেন। মৃতদেহ ও আহতদের বের করে অ্যাম্বুলেন্সে পৌঁছনো থেকে শুরু রে আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা, তাদের চিকিৎসার জন্য রক্তের ও খাদ্য-পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, দুর্ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত স্বয়ংসেবকরা সারা রাত ধরে অবিরতভাবে ত্রাণ ও সেবাকাজে শামিল হন। স্বয়ংসেবকরা তাদের নিজেদের ফোন থেকে আহত যাতীদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলতেও সহায়তা করেন।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, বজরংদল, সেবাভারতীর মতো একাধিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকশো কার্যকর্তা এই ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে যুক্ত হয়েছেন। দুর্ঘনায় নিহত যাত্রীদের মৃতদেহ নিতে তাদের নিকটাত্মীয়দের সহায়তা কাজে কটকের এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সঙ্ঘের সেবা বিভাগের স্বয়ংসেবকরা সক্রিয় ছিলেন। আহত যাত্রীদের জন্য হাসপাতালগুলিতে অ্যাটেন্ডেন্টের ব্যবস্থা করা ও আহতদের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজখবর দেওয়ার কাজে স্বয়ংসেবকরা তাদের হাত বাড়িয়ে দেন। সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় সেবা প্রমুখ জগদীশ খাড়াঙ্গা ও প্রান্ত সেবা প্রমুখ শান্তনু মাঝির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ত্রাণকার্য সম্পন্ন হয়।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৪৮।।

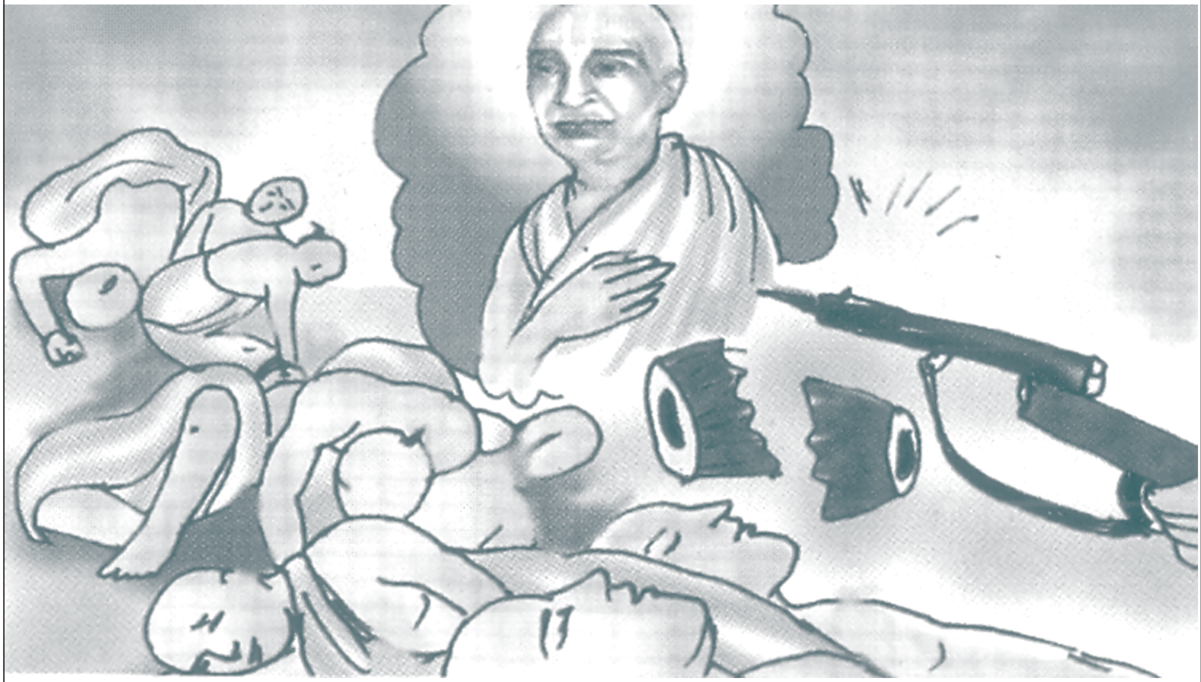

ফরিদপুরে শ্রী অঙ্গনে কীর্তনরত ৮ জন সাধুকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনারা গুলিবিদ্ধ করে। বেদনায় ও ক্ষোভে ব্রহ্মচারিজী হত বিহ্বল হলেন।

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের সভায় ভক্তিভূষণ মণ্ডল, অপূর্বলাল মজুমদার, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত, জীর্ণ, ভগ্ন উপবাসী ড: ব্রহ্মচারীজী শপথ করলেন— 'যতদিন না বাংলাদেশ মুক্ত হয়, ততদিন অন্নগ্রহণ করব না।'

(ক্রমশ)